স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

স্বামীজীর কথা

স্বামী বিবেকানন্দ

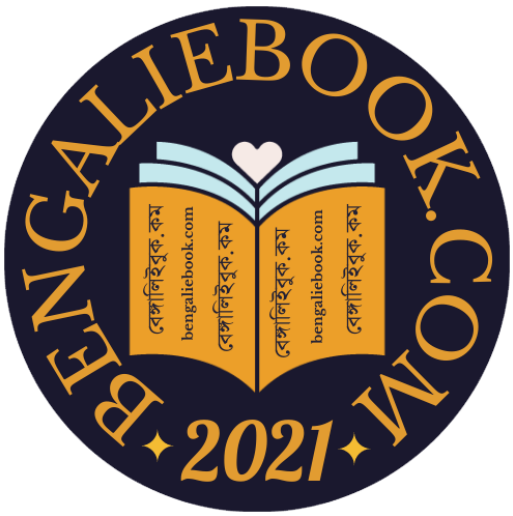

সূচিপত্র

১. স্বামীজীর অস্ফুট স্মৃতি.....2
২. স্বামীজীর কথা.....30
৩. স্বামীজীর সহিত কয়েক দিন.....34
৪. স্বামীজীর স্মৃতি.....65
৫. তিনদিনের স্মৃতিলিপি.....98

১. স্বামীজীর অস্ফুট স্মৃতি

স্বামীজীর অস্ফুট স্মৃতি

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরী মাস। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশ বিজয় করিয়া সবে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। যখন হইতে স্বামীজী চিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের বিজয়কেতন উড়াইয়াছেন, তখন হইতেই তৎসম্বন্ধীয় যে-কোন বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই সাগ্রহে পাঠ করিতেছি। তখন ২।৩ বৎসর মাত্র কলেজ ছাড়িয়াছি, কোনরূপ অর্থোপার্জনাদিও করি না, সুতরাং কখনও বন্ধুবান্ধবদের বাটী গিয়া, কখনও বা বাটীর নিকটস্থ ধর্মতলায় 'ইণ্ডিয়ান মিরর' অফিসের বহির্দেশে বোর্ডসংলগ্ন 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় স্বামীজীর সম্বন্ধে যে-কোন সংবাদ বা তাঁহার যে-কোন বক্তৃতা প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই সাগ্রহে পাঠ করি। এইরূপে স্বামীজী ভারতে পদার্পণ করা অবধি সিংহলে বা মান্দ্রাজে যাহা কিছু বলিয়াছেন, প্রায় সব পাঠ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আলমবাজার মঠে গিয়া তাঁহার গুরুভাইদের নিকট এবং মঠে যাতায়াতকারী বন্ধুবান্ধবদের নিকটও তাঁহার অনেক কথা শুনিয়াছি ও শুনিতেছি। আর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুখপত্রসমূহ যথা—বঙ্গবাসী, অমৃতবাজার, হোপ, থিওজফিষ্ট প্রভৃতি—যাঁহার যেরূপ ভাব তদনুসারে কেহ বিদ্রূপচ্ছলে, কেহ উপদেশ- দানচ্ছলে, কেহ বা মুরুব্বিয়ানা ধরনে—যিনি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিতেছেন, তাহারও প্রায় কিছুই জানিতে বাকী নাই।

আজ সেই স্বামী বিবেকানন্দ শিয়ালদহ ষ্টেশনে তাঁহার জন্মভূমি কলিকাতা নগরীতে পদার্পণ করিবেন, আজ তাঁহার শ্রীমূর্তি-দর্শনে চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন হইবে, তাই প্রত্যূষে উঠিয়াই শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এত প্রত্যূষেই স্বামীজীর অভ্যর্থনার্থ বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। অনেক পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাঁহার সম্বন্ধে কথাবার্তা হইতে লাগিল। দেখিলাম, ইংরেজীতে মুদ্রিত দুইটি কাগজ বিতরিত হইতেছে। পড়িয়া দেখিলাম, তাঁহার লণ্ডনবাসী ও আমেরিকাবাসী ছাত্রবৃন্দ বিদায়কালে তাঁহার গুণগ্রাম বর্ণন করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক যে অভিনন্দনপত্রদ্বয় প্রদান

করেন, ঐ দুইটি তাহাই। ক্রমে স্বামীজীর দর্শনার্থী লোকসমূহ দলে দলে সমাগত হইতে লাগিল। ষ্টেশন-প্লাটফর্ম লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সকলেই পরস্পরকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, স্বামীজীর আসিবার আর কত বিলম্ব? শুনা গেল, তিনি একখানা স্পেশাল ট্রেনে আসিবেন, আসিবার আর বিলম্ব নাই। ঐ যে—গাড়ীর শব্দ শুনা যাইতেছে, ক্রমে সশব্দে ট্রেন প্লাটফর্মে প্রবেশ করিল।

স্বামীজী যে গাড়ীখানিতে ছিলেন, সেটি যেখানে আসিয়া থামিল, সৌভাগ্যক্রমে আমি ঠিক তাহার সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিলাম। যাই গাড়ী থামিল, দেখিলাম স্বামীজী দাঁড়াইয়া সমবেত সকলকে করজোড়ে প্রণাম করিলেন। এই এক প্রণামেই স্বামীজী আমার হৃদয় আকর্ষণ করিলেন। তখন ট্রেনমধ্যস্থ স্বামীজীর মূর্তি মোটামুটি দেখিয়া লইলাম। তারপরেই অভ্যর্থনা-সমিতির শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন-প্রমুখ ব্যক্তিগণ আসিয়া তাঁহাকে ট্রেন হইতে নামাইয়া কিছু দূরবর্তী একখানি গাড়ীতে উঠাইলেন। অনেকে স্বামীজীকে প্রণাম ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন। সেখানে খুব ভিড় জমিয়া গেল। এদিকে দর্শকগণের হৃদয় হইতে স্বতই 'জয় স্বামী বিবেকানন্দজী কী জয়' 'জয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কী জয়'—এই আনন্দধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। আমিও প্রাণ ভরিয়া সেই আনন্দধ্বনিতে যোগ দিয়া জনতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে যখন ষ্টেশনের বাহিরে পঁহুছিয়াছি, তখন দেখি অনেকগুলি যুবক স্বামীজীর গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া নিজেরাই টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। আমিও তাহাদের সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিলাম, ভিড়ের জন্য পারিলাম না। সুতরাং সে চেষ্টা ত্যাগ করিয়া একটু দূরে দূরে স্বামীজীর গাড়ীর সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ষ্টেশনে স্বামীজীকে অভ্যর্থনার্থ একটি হরিনাম-সংকীর্তনদলকে দেখিয়াছিলাম। রাস্তায় একটি ব্যাণ্ড পার্টি বাজনা বাজাইতে বাজাইতে স্বামীজীর সঙ্গে চলিল, দেখিলাম। রিপন কলেজ পর্যন্ত রাস্তা নানাবিধ পতাকা, লতা, পাতা ও পুষ্পে সজ্জিত হইয়াছিল। গাড়ী আসিয়া রিপন কলেজের সম্মুখে দাঁড়াইল। এইবার স্বামীজীকে বেশ ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলাম। দেখিলাম, তিনি মুখ বাড়াইয়া কোন পরিচিত ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছেন। মুখখানি তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, যেন জ্যোতিঃ ফুটিয়া বাহির হইতেছে, তবে পথের শ্রান্তিতে কিঞ্চিৎ ঘর্মাক্ত

ও মলিন হইয়াছে মাত্র। দুইখানি গাড়ী—একটিতে স্বামীজী এবং মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার; মাননীয় চারুচন্দ্র মিত্র ঐ গাড়ীতে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া জনতাকে নিয়মিত করিতেছেন। অপরটিতে গুডউইন, হ্যারিসন (সিংহল হইতে স্বামীজীর সঙ্গী জনৈক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সাহেব), জি.জি, কিডি ও আলাসিঙ্গা নামক তিনজন মান্দ্রাজী শিষ্য এবং ত্রিগুণাতীত স্বামী।।

যাহা হউক, অল্পক্ষণ গাড়ী দাঁড়াইবার পরই অনেকের অনুরোধে স্বামীজী রিপন কলেজ-বাটীতে প্রবেশ করিয়া সমবেত সকলকে সম্বোধন করিয়া দুই-তিন মিনিট ইংরেজীতে একটু বলিয়া আবার ফিরিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। এবার আর শোভাযাত্রা করা হইল না। গাড়ী বাগবাজারে পশুপতি বাবুর বাটীর দিকে ছুটিল। আমিও মনে মনে স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিলাম।

* * *

আহারাদির পর মধ্যাহ্নে চাঁপাতলায় খগেনদের (স্বামী বিমলানন্দ) বাটীতে গেলাম। সেখান হইতে খগেন ও আমি তাহাদের একখানি টমটমে চড়িয়া পশুপতি বসুর বাটী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। স্বামীজী উপরের ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন, বেশী লোকজনকে যাইতে দেওয়া হইতেছে না। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের পরিচিত স্বামীজীর কয়েকজন গুরুভাই-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। স্বামী শিবানন্দ আমাদিগকে স্বামীজীর নিকট লইয়া গেলেন এবং পরিচয় করিয়া দিলেন—'এরা আপনার খুব admirer (মুগ্ধ ভক্ত)।'

স্বামীজী ও যোগানন্দ স্বামী পশুপতি বাবুর দ্বিতলস্থ একটি সুসজ্জিত বৈঠকখানায় পাশাপাশি দুইখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন। অন্যান্য স্বামিগণ উজ্জ্বল গৈরিক-বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছিলেন। মেজে কার্পেট-মোড়া ছিল। আমরা প্রণাম করিয়া সেই কার্পেটের উপর উপবেশন করিলাম। স্বামীজী যোগানন্দ-স্বামীর সহিত তখন কথা কহিতেছিলেন। আমেরিকা-ইওরোপে স্বামীজী কি দেখিলেন, এই প্রসঙ্গ হইতেছিল। স্বামীজী বলিতেছিলেনঃ

দেখ্ যোগে, দেখলুম কি জানিস?—সমস্ত পৃথিবীতে এক মহাশক্তিই খেলা করছে। আমাদের বাপ-দাদারা সেইটেকে religion-এর দিকে manifest (প্রকাশ) করেছিলেন, আর আধুনিক পাশ্চাত্যদেশীয়েরা সেইটেকেই মহারজোগুণের ক্রিয়ারূপে manifest করছে। বাস্তবিক সমগ্র জগতে সেই এক মহাশক্তিরই বিভিন্ন খেলা হচ্ছে মাত্র।

খগেনের দিকে চাহিয়া তাহাকে খুব রোগা দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'এ ছেলেটিকে বড় sickly দেখছি যে।' ।

স্বামী শিবানন্দ উত্তর করলেন, 'এটি অনেক দিন থেকে chronic dyspepsia-তে (পুরানো অজীর্ণ রোগে) ভুগছে।' ।

স্বামীজী বলিলেন, 'আমাদের বাঙলা দেশটা বড় sentimental (ভাবপ্রবণ) কিনা, তাই এখানে এত dyspepsia.'।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা প্রণাম করিয়া উঠিয়া বাটী ফিরিলাম।।

স্বামীজী এবং তাঁহার শিষ্য মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগানবাটীতে অবস্থান করিতেছেন। স্বামীজীর মুখের কথাবার্তা ভাল করিয়া শুনিবার জন্য ঐ স্থানে বিভিন্ন বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে করিয়া কয়েকদিন গিয়াছিলাম। তাহার যতগুলি স্মরণ হয়, এইবার তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব।।

স্বামীজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ কথোপকথন হয়—প্রথম এই বাগানবাটীর একটি ঘরে। স্বামীজী আসিয়া বসিয়াছেন, আমিও গিয়া প্রণাম করিয়া বসিয়াছি, সেখানে আর কেহ নাই। হঠাৎ কেন জানি না—স্বামীজী আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুই কি তামাক খাস?' ।

আমি বলিলাম, 'আজ্ঞে না।'

তাহাতে স্বামীজী বলিলেন, 'হাঁ, অনেকে বলে—তামাকটা খাওয়া ভাল নয়; আমিও ছাড়বার চেষ্টা করছি।'

আর একদিন স্বামীজীর নিকট একটি বৈষ্ণব আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত স্বামীজী কথা কহিতেছেন। আমি একটু দূরে রহিয়াছি, আর কেহ নাই। স্বামীজী বলিতেছেন, 'বাবাজী, আমেরিকাতে আমি একবার শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করি। সেই বক্তৃতা শুনে একজন পরমাসুন্দরী যুবতী—অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারিণী—সর্বস্ব ত্যাগ করে এক নির্জন দ্বীপে গিয়ে কৃষ্ণধ্যানে উন্মত্তা হলেন।' তারপর স্বামীজী ত্যাগ সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন, 'যে-সব ধর্মসম্প্রদায়ে ত্যাগের ভাবের তেমন প্রচার নেই, তাদের ভেতর শীঘ্রই অবনতি এসে থাকে—যথা বল্লভাচার্য সম্প্রদায়।' ।

আর একদিন গিয়াছি। দেখি, অনেকগুলি লোক বসিয়া আছেন এবং একটি যুবককে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী কথাবার্তা কহিতেছেন। যুবকটি বেঙ্গল থিওজফিক্যাল সোসাইটির গৃহে থাকে। সে বলিতেছি, 'আমি নানা সম্প্রদায়ের নিকট যাইতেছি, কিন্তু সত্য কি—নির্ণয় করিতে পারতেছি না।' । '

স্বামীজী অতি স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিতেছেন, 'দেখ বাবা, আমারও একদিন তোমারই মত অবস্থা ছিল; তা তোমার ভাবনা কি? আচ্ছা, ভিন্ন ভিন্ন লোকে তোমাকে কি কি বলেছিল এবং তুমি বা কি রকম করেছিলে বল দেখি?'

যুবক বলিতে লাগিলেন, 'মহাশয়, আমাদের সোসাইটিতে ভবানীশঙ্কর নামক একজন পণ্ডিত প্রচারক আছেন, তিনি আমায় মূর্তিপূজার দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতির যে বিশেষ সহায়তা হয়, তা সুন্দররূপে বুঝিয়ে দিলেন, আমিও তদনুসারে দিন কতক খুব পূজা-অর্চনা করতে লাগলুম, কিন্তু তাতে শান্তি পেলুম না। সে সময়ে একজন আমাকে উপদেশ দিলেন, 'দেখ, মনটাকে একেবারে শূন্য করবার চেষ্টা কর দেখি—তাতে পরম শান্তি পাবে।' আমি দিন-কতক সেই চেষ্টাই করতে লাগলুম, কিন্তু তাতেও আমার মন শান্ত হল না। আমি, মহাশয়, এখনও একটি ঘরে দরজা বন্ধ করে যতক্ষণ সম্ভব বসে থাকি, কিন্তু শান্তিলাভ কিছুতেই হচ্ছে না। বলতে পারেন, কিসে শান্তি হয়?'

স্বামীজী স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'বাপু, আমার কথা যদি শোন, তবে তোমাকে আগে তোমার ঘরের দরজাটি খুলে রাখতে হবে। তোমার বাড়ীর কাছে, পাড়ার কাছে কত অভাবগ্রস্ত লোক রয়েছে, তোমায় তাদের যথাসাধ্য সেবা করতে হবে। যে পীড়িত, তাকে ঔষধ পথ্য যোগাড় করে দিলে এবং শরীরের দ্বারা সেবাশুশ্রূষা করলে। যে খেতে পাচ্ছে না, তাকে খাওয়ালে। যে অজ্ঞান, তাকে—তুমি যে এত লেখাপড়া শিখেছ, মুখে মুখে যতদূর হয় বুঝিয়ে দিলে। আমার পরামর্শ যদি চাও বাপু, তা হলে এইভাবে যথাসাধ্য লোকের সেবা করতে পারলে তুমি মনের শান্তি পাবে।' ।

যুবকটি বলিল, 'আচ্ছা মহাশয়, ধরুন আমি একজন রোগীর সেবা করতে গেলাম, কিন্তু তার জন্য রাত জেগে, সময়ে না খেয়ে, অত্যাচার করে আমার নিজেরই যদি রোগ হয়ে পড়ে?'

স্বামীজী এতক্ষণ যুবকটির সহিত স্নেহপূর্ণ স্বরে সহানুভূতির সহিত কথাবার্তা বলিতেছিলেন। এই শেষ কথাটিতে একটু বিরক্ত হইলেন, বোধ হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—'দেখ বাপু, রোগীর সেবা করতে গিয়ে তুমি তোমার নিজের রোগের আশঙ্কা করছ, কিন্তু তোমার কথাবার্তা শুনে আর ভাবগতিক দেখে আমার বোধ হচ্ছে এবং উপস্থিত যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাও সকলে বেশ বুঝতে পারছেন যে, তুমি এমন করে রোগীর সেবা কোন কালে করবে না, যাতে তোমার নিজের রোগ হয়ে যাবে।'

যুবকটির সঙ্গে আর বিশেষ কথাবার্তা হইল না।'

আর একদিন মাষ্টার২ মহাশয়ের সঙ্গে কথা হইতেছে। মাষ্টার মহাশয় বলিতেছেন, 'দেখ, তুমি যে দয়া, পরোপকার বা জীবসেবার কথা বল, সে তো মায়ার রাজ্যের কথা। যখন বেদান্তমতে মানবের চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভ—সমুদয় মায়ার বন্ধন কাটান, তখন ও-সব মায়ার ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে লোককে ঐ বিষয়ের উপদেশ দিয়া ফল কি?'

স্বামীজী বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়াই উত্তর দিলেন, 'মুক্তিটাও কি মায়ার অন্তর্গত নয়? আত্মা তো নিত্যমুক্ত, তার আবার মুক্তির জন্য চেষ্টা কি?'

মাষ্টার মহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন।

টমাস আ কেম্পিস-এর 'Imitation of Christ'-এর প্রসঙ্গ উঠিল। স্বামীজী সংসারত্যাগ করিবার কিছু পূর্বে এই গ্রন্থখানি বিশেষভাবে চর্চা করিতেন এবং বরাহনগর মঠে অবস্থানকালে তাঁহার গুরুভাইরাও স্বামীজীর দৃষ্টান্তে ঐ গ্রন্থটি সাধক-জীবনের বিশেষ সহায়ক জ্ঞানে সদা সর্বদা উহার আলোচনা করিতেন। স্বামীজী ঐ গ্রন্থের এরূপ অনুরাগী ছিলেন যে, তদানীন্তন 'সাহিত্যকল্পদ্রুম' নামক মাসিকপত্রে উহার একটি সূচনা লিখিয়া 'ঈশানুসরণ' নামে ধারাবাহিক অনুবাদ করিতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন বোধ হয় স্বামীজীর উক্ত গ্রন্থের উপর এখন কিরূপ ভাব জানিবার জন্য—উহার ভিতরে দীনতার যে উপদেশ আছে, তাহার প্রসঙ্গ পাড়িয়া বলিলেন, 'নিজেকে এইরূপ একান্ত হীন ভাবিতে না পারিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি কিরূপে সম্ভবপর হইবে?' স্বামীজী শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমরা আবার হীন কিসে? আমাদের আবার অন্ধকার কোথায়? আমরা যে জ্যোতির রাজ্যে বাস করছি, আমরা যে জ্যোতির তনয়!' ।

গ্রন্থোক্ত ঐ প্রাথমিক সাধন-সোপান অতিক্রম করিয়া স্বামীজী সাধন-রাজ্যের কত উচ্চ ভূমিতে উপনীত হইয়াছেন!

আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতাম, সংসারের অতি সামান্য ঘটনাও তাঁহার তীক্ষ্নদৃষ্টিকে অতিক্রম করিতে পারিত না, উহার সাহায্যেও তিনি উচ্চ ধর্মভাব-প্রচারের চেষ্টা করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায়, মঠের প্রাচীন সাধুগণ যাঁহাকে 'রামলাল-দাদা' বলিয়া নির্দেশ করেন, দক্ষিণেশ্বর হইতে একদিন স্বামীজীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। স্বামীজী একখানি চেয়ার আনাইয়া তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন এবং স্বয়ং পায়চারি করিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধাবিনম্র দাদা তাহাতে একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'আপনি বসুন, আপনি বসুন।' স্বামীজী কিন্তু কোনমতে ছাড়িবার

পাত্র নহেন, অনেক বলিয়া কহিয়া দাদাকে চেয়ারে বসাইলেন এবং স্বয়ং বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন, 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।'

অনেকগুলি ছাত্র আসিয়াছে। স্বামীজী একখানি চেয়ারে ফাঁকায় বসিয়া আছেন। সকলেই তাঁহার নিকটে বসিয়া তাঁহার দুটা কথা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব, অথচ সেখানে আর কোন আসন নাই, যাহাতে ছেলেদের বসিতে বলা যায়—কাজেই তাহাদিগকে ভূমিতে বসিতে হইল। স্বামীজীর মনে হইতেছিল ইহাদিগকে বসিবার কোন আসন দিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু আবার বুঝি তাঁহার মনে অন্য ভাবের উদয় হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'তা বেশ, তোমরা বেশ বসেছ, একটু একটু তপস্যা করা ভাল।'

আমাদের পাড়ার চণ্ডীচরণ বর্ধনকে একদিন লইয়া গিয়াছি। চণ্ডীবাবু Hindu Boys School নামক একটি ছোটখাট বিদ্যালয়ের স্বত্বাধিকারী, সেখানে ইংরেজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যাপনা করান হয়। তিনি পূর্ব হইতেই ঈশ্বরানুরাগী ছিলেন, পরে স্বামীজীর বক্তৃতাদি পাঠ করিয়া তাঁহার উপর খুব শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠেন।

চণ্ডীবাবু আসিয়া স্বামীজীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বামীজী, কি রকম ব্যক্তিকে গুরু করা যেতে পারে?'

স্বামীজী বলিলেন, 'যিনি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু। দেখ না, আমার গুরু আমার ভূত ভবিষ্যৎ—সব বলে দিয়েছিলেন।'

চণ্ডীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা স্বামীজী, কৌপীন পরলে কি কাম-দমনের বিশেষ সহায়তা হয়?'

স্বামীজী বলিলেন, 'একটু-আধটু সাহায্য হতে পারে। কিন্তু যখন ঐ বৃত্তি প্রবল হয়ে উঠে, তখন কি বাপ, কৌপীনে আটকায়? মনটা ভগবানে একেবারে তন্ময় না হয়ে গেলে বাহ্য কোন উপায়ে কাম একেবারে যায় না। তবে কি জান—যতক্ষণ লোকে সেই অবস্থা সম্পূর্ণ লাভ না করে, ততক্ষণ নানা বাহ্য উপায়- অবলম্বনের চেষ্টা স্বভাবতই করে থাকে। আমার

একবার এমন কামের উদয় হয়েছিল যে, আমি নিজের উপর মহা বিরক্ত হয়ে আগুনের মালসার উপর বসেছিলাম। শেষে ঘা শুকাতে অনেক দিন লাগে।'

চণ্ডীবাবু একটু ভাবপ্রবণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া ইংরেজীতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ' Oh Great Teacher, tear up the veil of hypocrisy and teach the world the one thing needful—how to conquer lust.'

স্বামীজী চণ্ডীবাবুকে শান্ত ও আশ্বস্ত করিলেন।

পরে Edward Carpenter-এর প্রসঙ্গ উঠিল। স্বামীজী বলিলেন, 'লণ্ডনে ইনি অনেক সময় আমার কাছে এসে বসে থাকতেন। আরও অনেক Socialist Democrat প্রভৃতি আসতেন। তাঁরা বেদান্তোক্ত ধর্মে তাঁদের নিজ নিজ মতের পোষকতা পেয়ে বেদান্তের উপর খুব আকৃষ্ট হতেন।'

স্বামীজী উক্ত কার্পেণ্টার সাহেবের 'Adam's Peak to Elephanta' নামক গ্রন্থখানি পড়িয়াছিলেন। এইবার উক্ত পুস্তকে মুদ্রিত চণ্ডীবাবুর ছবিটির কথা তাঁহার মনে পড়িল, বলিলেন, 'আপনার চেহারা যে বই-এ আগেই দেখেছি।' আরও কিয়ৎক্ষণ আলাপের পর সন্ধ্যা হইয়া যাওয়াতে স্বামীজী বিশ্রামের জন্য উঠিলেন। উঠিবার সময় চণ্ডীবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'চণ্ডীবাবু, আপনারা তো অনেক ছেলের সংস্রবে আসেন, আমায় গুটিকতক সুন্দর সুন্দর ছেলে দিতে পারেন?' চণ্ডীবাবু বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ছিলেন, স্বামীজীর কথার সম্পূর্ণ মর্ম পরিগ্রহ করিতে পারেন নাই; স্বামীজী যখন বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করিতেছেন, তখন অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 'সুন্দর ছেলের কথা কি বলছিলেন?'

স্বামীজী বলিলেন, ' চেহারা দেখতে ভাল, এমন ছেলে আমি চাচ্ছি না—আমি চাই বেশ সুস্থশরীর, কর্মঠ, সৎপ্রকৃতি কতকগুলি ছেলে, তাদের trained করতে চাই, যাতে তারা নিজেদের মুক্তিসাধনের জন্য ও জগতের কল্যাণসাধনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।'

আর একদিন গিয়া দেখি, স্বামীজী ইতস্ততঃ বেড়াইতেছেন, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীও স্বামীজীর সহিত খুব পরিচিতভাবে আলাপ করিতেছেন। স্বামীজীকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমাদের অতিশয় কৌতূহল হইল। প্রশ্নটি এইঃ অবতার ও মুক্ত বা সিদ্ধ পুরুষে পার্থক্য কি? আমরা শরৎবাবুকে স্বামীজীর নিকট ঐ প্রশ্নটি উত্থাপিত করিতে বিশেষ অনুরোধ করাতে তিনি অগ্রসর হইয়া তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা শরৎবাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্বামীজীর নিকট যাইয়া তিনি ঐ প্রশ্নের কি উত্তর দেন, তাহা শুনিতে লাগিলাম। স্বামীজী উক্ত প্রশ্নে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, 'বিদেহমুক্তিই যে সর্বোচ্চ অবস্থা–এ আমার সিদ্ধান্ত, তবে সাধনাবস্থায় যখন ভারতের নানাদিকে ভ্রমণ করতুম, তখন কত গুহায় নির্জনে বসে কত কাল কাটিয়েছি, কতবার মুক্তিলাভ হল না বলে প্রায়োপবেশন করে দেহত্যাগ করবার সঙ্কল্প করেছি, কত ধ্যান–কত সাধন-ভজন করেছি, কিন্তু এখন আর মুক্তিলাভের জন্য সে বিজাতীয় আগ্রহ নাই। এখন কেবল মনে হয়, যত দিন পর্যন্ত পৃথিবীর একটা লোকও অমুক্ত থাকছে, ততদিন আমার নিজের মুক্তির কোন প্রয়োজন নেই।'

আমি স্বামীজীর উক্ত কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ের অপার করুণার কথা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলাম; আরও ভাবিতে লাগিলাম, ইনি কি নিজ দৃষ্টান্ত দিয়া অবতারপুরুষের লক্ষণ বুঝাইলেন? ইনিও কি একজন অবতার? আরও মনে হইল, স্বামীজী এক্ষণে মুক্ত হইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার মুক্তির জন্য আর আগ্রহ নাই।

আর একদিন আমি ও খগেন (স্বামী বিমলানন্দ) সন্ধ্যার পর গিয়াছি। ঠাকুরের ভক্ত হরমোহন বাবু আমাদিগকে স্বামীজীর সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়া দিবার জন্য বলিলেন, 'স্বামীজী, এঁরা আপনার খুব admirer এবং খুব বেদান্ত আলোচনা করেন।' স্বামীজী বেদান্তের কথা শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'উপনিষদ্ কিছু পড়েছ?'

আমি॥ আজ্ঞা হাঁ, একটু-আধটু দেখেছি।

স্বামীজী॥ কোন্ উপনিষদ্ পড়েছ?

আমি॥ কঠ উপনিষদ্ পড়েছি।

স্বামীজী॥ আচ্ছা, কঠ-টাই বল, কঠ উপনিষদ্ খুব grand—কবিত্বপূর্ণ।

আমি॥ কঠটা মুখস্থ নেই—গীতা থেকে খানিকটা বলি।

স্বামীজী॥ আচ্ছা, তাই বল।

তখন গীতার একাদশ অধ্যায়ের শেষভাগস্থ 'স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা' হইতে আরম্ভ করিয়া অর্জুনের সমুদয় স্তবটা আওড়াইয়া দিলাম।

শুনিয়া স্বামীজী উৎসাহ দিবার জন্য 'বেশ, বেশ' বলিতে লাগিলেন। ইহার পরদিন বন্ধুবর রাজেন্দ্রনাথ ঘোষকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজীর দর্শনার্থ গিয়াছি। রাজেনকে বলিয়াছি, 'ভাই, কাল স্বামীজীর কাছে উপনিষদ্ নিয়ে বড় অপ্রস্তুত হয়েছি। তোমার নিকট উপনিষদ্ কিছু থাকে তো পকেটে করে নিয়ে চল। যদি কালকের মত উপনিষদের কথা পাড়েন তো তাই পড়লেই চলবে।' রাজেনের নিকট একখানি প্রসন্নকুমার শাস্ত্রীকৃত ঈশকেনকঠাদি উপনিষদ্ ও তাহার বঙ্গানুবাদ পকেট এডিশন ছিল, সেটি পকেটে করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। অদ্য অপরাহ্নে একঘর লোক বসিয়াছিলেন; যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইল। আজও কিরূপে ঠিক স্মরণ নাই—কঠ-উপনিষদের প্রসঙ্গ উঠিল। আমি অমনি তাড়াতাড়ি পকেট হইতে বাহির করিয়া ঐ উপনিষদের গোড়া হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। পাঠের অন্তরালে স্বামীজী নচিকেতার শ্রদ্ধার কথা—যে শ্রদ্ধায় তিনি নির্ভীক-চিত্তে যমভবনে যাইতেই সাহসী হইয়াছিলেন—বলিতে লাগিলেন। যখন নচিকেতার দ্বিতীয় বর—স্বর্গপ্রাপ্তির কথা পড়া হইতে লাগিল, তখন সেইখানটা বেশী না পড়িয়া কিছু কিছু ছাড়িয়া দিয়া তৃতীয় বরের স্থানটা পড়িতে বলিলেন।

নচিকেতা বলিলেন, মৃত্যুর পর লোকের সন্দেহ—দেহ গেলে কিছু থাকে কিনা, তারপর যমের নচিকেতাকে প্রলোভন-প্রদর্শন ও নচিকেতার দৃঢ়ভাবে তৎসমুদয় প্রত্যাখ্যান। এই-

সব খানিকটা পড়া হইলে স্বামীজী তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় ঐ সম্বন্ধে কত কি বলিলেন!

কিন্তু এই দুই দিনের উপনিষদ্-প্রসঙ্গে স্বামীজীর উপনিষদে শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কিয়দংশ আমার ভিতর সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল। কারণ, তাহার পর হইতে যখনই সুযোগ পাইয়াছি, পরম শ্রদ্ধার সহিত উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। বিভিন্ন সময়ে তাঁহার মুখে উচ্চারিত অপূর্ব সুর লয় তাল ও তেজস্বিতার সহিত পঠিত উপনিষদের এক একটি মন্ত্র যেন এখনও দিব্য কর্ণে শুনিতে পাই। যখন পরচর্চায় মগ্ন হইয়া আত্মচর্চা ভুলিয়া থাকি, তখন শুনিতে পাই—তাঁহার সেই সুপরিচিত কিন্নরকণ্ঠোচ্চারিত উপনিষদুক্ত বাণীর দিব্য গম্ভীর ঘোষণাঃ

'তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ।'৪ —সেই একমাত্র আত্মাকে জান, অন্য বাক্য সব পরিত্যাগ কর, তিনিই অমৃতের সেতু।

যখন আকাশ ঘোরঘটাচ্ছন্ন হয়—বিদ্যুল্লতা চমকিতে থাকে, তখন যেন শুনিতে পাই—স্বামীজী সেই আকাশস্থা সৌদামিনীর দিকে অঙ্গুলি বাড়াইয়া বলিতেছেনঃ

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদ বভাতি॥৫

সেখানে সূর্যও প্রকাশ পায় না,চন্দ্র-তারাও নহে, এইসব বিদ্যুৎও সেখানে প্রকাশ পায় না—এই সামান্য অগ্নির কথা কি? তিনি প্রকাশিত থাকাতে তাঁহার পশ্চাৎ সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে—তাঁহার প্রকাশে এই সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে।

অথবা যখন তত্ত্বজ্ঞানকে সুদূরপরাহত মনে করিয়া হৃদয় হতাশায় আচ্ছন্ন হয়, তখন যেন শুনিতে পাই—স্বামীজী আনন্দোৎফুল্লমুখে উপনিষদের এই আশ্বাসবাণী আবৃত্তি করিতেছেনঃ

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
* * *
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥৬

হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যধাম-নিবাসিগণ, তোমরা শ্রবণ কর। আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি—যিনি আদিত্যের ন্যায় জ্যোতির্ময় ও অজ্ঞানান্ধকারের অতীত। তাঁহাকে জানিলেই লোকে মৃত্যুকে অতিক্রম করে—মুক্তির আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

* * *

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষ ভাগ। আলমবাজার মঠ। সবে চার-পাঁচ দিন হইল বাড়ী ছাড়িয়া মঠে রহিয়াছি। পুরাতন সন্ন্যাসিবর্গের মধ্যে স্বামী প্রেমানন্দ, নির্মলানন্দ ও সুবোধানন্দ মাত্র আছেন। স্বামীজী দার্জিলিঙ হইতে আসিয়া পড়িলেন—সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, স্বামীজীর মান্দ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমল, কিডি, জি.জি. প্রভৃতি।

স্বামী নিত্যানন্দ অল্প কয়েকদিন হইল স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন। ইনি স্বামীজীকে বলিলেন, ‘এখন অনেক নূতন নূতন ছেলে সংসার ত্যাগ করে মঠবাসী হয়েছেন, তাঁদের জন্য একটা নির্দিষ্ট নিয়মে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে বড় ভাল হয়।’

স্বামীজী তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুমোদন করিয়া বলিলেন, 'হাঁ, হাঁ—একটা নিয়ম করা ভাল বৈকি। ডাক সকলকে।' সকলে আসিয়া বড় ঘরটিতে জমা হইলেন। তখন স্বামীজী বলিলেন, 'একজন কেউ লিখতে থাক, আমি বলি।' তখন এ উহাকে সামনে ঠেলিয়া দিতে লাগিল—কেহ অগ্রসর হয় না, শেষে আমাকে ঠেলিয়া অগ্রসর করিয়া দিল। তখন মঠে লেখাপড়ার উপর সাধারণতঃ একটা বিতৃষ্ণা ছিল। সাধনভজন করিয়া ভগবানের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা—এইটিই সার, আর লেখাপড়াটা—উহাতে মানযশের ইচ্ছা আসিবে, যাহারা ভগবানের আদিষ্ট হইয়া প্রচারকার্যাদি করিবে, তাহাদের পক্ষে আবশ্যক হইলেও সাধকদের পক্ষে উহার প্রয়োজন তো নাই-ই, বরং উহা হানিকর—এই ধারণাই প্রবল ছিল। যাহা হউক, পূর্বেই বলিয়াছি, আমি কতকটা forward ও বেপরোয়া—আমি অগ্রসর হইয়া গেলাম। স্বামীজী একবার শূন্যের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কি থাকবে?' (অর্থাৎ আমি কি মঠের ব্রহ্মচারিরূপে তথায় থাকিব অথবা দুই-এক দিনের জন্য মঠে বেড়াইতে আসিয়াছি, আবার চলিয়া যাইব?) সন্ন্যাসিবর্গের মধ্যে একজন বলিলেন, 'হাঁ।' তখন আমি কাগজ কলম প্রভৃতি ঠিক করিয়া লইয়া গণেশের আসন গ্রহণ করিলাম। নিয়মগুলি বলিবার পূর্বে স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, 'দেখ্, এই-সব নিয়ম করা হচ্ছে বটে, কিন্তু প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে, এগুলি করবার মূল লক্ষ্য কি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—সব নিয়মের বাইরে যাওয়া। তবে নিয়ম করার মানে এই যে, আমাদের স্বভাবতই কতকগুলি কু-নিয়ম রয়েছে—সু-নিয়মের দ্বারা সেই কু-নিয়মগুলিকে দূর করে দিয়ে শেষে সব নিয়মের বাইরে যাবার চেষ্টা করতে হবে। যেমন কাঁটা তুলে শেষে দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।'

তারপর নিয়মগুলি লেখান হইতে লাগিল। প্রাতে ও সায়াহ্নে জপ ধ্যান, মধ্যাহ্নে বিশ্রামান্তে নিজে নিজে শাস্ত্রগ্রন্থাদি অধ্যয়ন ও অপরাহ্নে সকলে মিলিয়া একজন পাঠকের নিকট কোন নির্দিষ্ট শাস্ত্রগ্রন্থাদি শুনিতে হইবে, এই ব্যবস্থা হইল। প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে একটু একটু করিয়া ডেলসার্ট ব্যায়াম করিতে হইবে, তাহাও নির্দিষ্ট হইল। মাদকদ্রব্যের মধ্যে তামাক ছাড়া আর কিছু চলিবে না—এই ভাবের একটি নিয়ম লেখা হইল। শেষে সমুদয় লেখান শেষ করিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'দেখ্, একটু দেখে শুনে নিয়মগুলি ভাল

করে কপি করে রাখ্—দেখিস, যদি কোন নিয়মটা negative (নেতিবাচক) ভাবে লেখা হয়ে থাকে, সেটাকে positive (ইতিবাচক) করে দিবি।'

এই শেষোক্ত আদেশ-প্রতিপালনে আমাদিগকে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। স্বামীজীর উপদেশ ছিল—লোককে খারাপ বলা বা তাহার বিরুদ্ধে কু-সমালোচনা করা, তাহার দোষ দেখান, তাহাকে 'তুমি অমুক করো না, তমুক করো না'—এইরূপ negative উপদেশ দিলে তাহার উন্নতির বিশেষ সাহায্য হয় না; কিন্তু তাহাকে যদি একটা আদর্শ দেখাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই তাহার সহজে উন্নতি হইতে পারে, তাহার দোষগুলি আপনা-আপনি চলিয়া যায়।' ইহাই স্বামীজীর মূল কথা। স্বামীজীর সব নিয়মগুলিকে positive করিয়া লইবার উপদেশ আমাদের মনে বরাবর ঐ কথাই উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার আদেশমত যখন আমরা সব নিয়মগুলির মধ্য হইতে 'না' কথাটির সম্পর্ক রহিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তখন দেখিলাম, আর কোন নিয়মে কোন গোল নাই, কিন্তু মাদকদ্রব্যসম্বন্ধীয় নিয়মটাতেই একটু গোল। সেটি প্রথম এইভাবে লেখা হইয়াছিল—'মঠে তামাক ব্যতীত কেহ অন্য কোন মাদকদ্রব্য সেবন করিতে পারিবেন না।' যখন আমরা উহার মধ্যগত 'না'টিকে বাদ দিবার চেষ্টা করিলাম, তখন প্রথম দাঁড়াইল—'সকলে তামাক খাইবেন।' কিন্তু ঐরূপ বাক্যের দ্বারা সকলের উপর (যে না খায়, তাহারও উপর) তামাক খাইবার বিধি আসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া, শেষে অনেক মাথা খাটাইয়া নিয়মটি এইরূপ দাঁড়াইল—'মঠে কেবলমাত্র তামাক সেবন করিতে পারিবেন।' যাহা হউক, এখন মনে হইতেছে—আমরা একটা বিকট আপোষ করিয়াছিলাম। Detail-এর (খুঁটিনাটির) ভিতর আসিলে বিধিনিষেধের মধ্যে নিষেধটাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না; তবে ইহাই সত্য যে, এই বিধিনিষেধগুলি যত মূলভাবের অনুগামী হয়, ততই উহাতে অধিকতর উপযোগিতা দাঁড়ায়। আর স্বামীজীরও ঐরূপ অভিপ্রায়ই ছিল।

একদিন অপরাহ্নে বড় ঘরে একঘর লোক। ঘরের মধ্যে স্বামীজী অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন, নানা প্রসঙ্গ চলিতেছে। আমাদের বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ বসু (আলিপুর আদালতের স্বনামখ্যাত উকিল) মহাশয়ও আছেন। তখন বিজয়বাবু সময়ে সময়ে নানা

সভায়—এমন কি, কখনও কখনও কংগ্রেসে দাঁড়াইয়াও ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার এই বক্তৃতাশক্তির কথা কেহ স্বামীজীর নিকট উল্লেখ করিলে স্বামীজী বলিতেন, 'তা বেশ বেশ। আচ্ছা, অনেক লোক এখানে সমবেত আছেন—এখানে দাঁড়িয়ে একটু বক্তৃতা কর দেখি। আচ্ছা—Soul (আত্মা) সম্বন্ধে তোমার যা idea (ধারণা), তাই খানিকটা বল।' বিজয়বাবু নানা ওজর করিতে লাগিলেন—স্বামীজী এবং আর আর অনেকেও তাঁহাকে খুব পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অন্ততঃ ১৫ মিনিট অনুরোধ-উপরোধের পরও যখন কেহ তাঁহার সঙ্কোচ ভাঙিতে কৃতকার্য হইলেন না, তখন অগত্যা হার মানিয়া তাঁহাদের দৃষ্টি বিজয়বাবু হইতে আমার উপর পড়িল। আমি মঠে যোগ দিবার পূর্বে কখনও কখনও ধর্মসম্বন্ধে বাঙলাভাষায় বক্তৃতা করিতাম, আর আমাদের এক ডিবেটিং ক্লাব ছিল, তাহাতে ইংরেজী বলিবার অভ্যাস করিতাম। আমার সম্বন্ধে এই-সকল বিষয় কেহ উল্লেখ করাতেই এবার আমার উপর চোট পড়িল, আর পূর্বেই বলিয়াছি, আমি অনেকটা বেপরোয়া। আমাকে আর বেশী বলিতে হইল না। আমি একেবারে দাঁড়াইয়া পড়িলাম এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদান্তর্গত আত্মতত্ত্বের বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া 'আত্মা' সম্বন্ধে প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া যা মুখে আসিল বলিয়া গেলাম। ভাষা বা ব্যাকরণের ভুল হইতেছে বা ভাবের অসামঞ্জস্য হইতেছে, এ-সকল খেয়ালই করিলাম না। দয়ার সাগর স্বামীজী আমার এই হঠকারিতায় কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া আমায় খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন। আমার পরে স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত প্রকাশানন্দ স্বামী প্রায় ১০ মিনিটকাল ধরিয়া আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে বলিলেন। তিনি স্বামীজীর বক্তৃতার প্রারম্ভের অনুকরণ করিয়া বেশ গম্ভীর স্বরে নিজ বক্তব্য বলিতে লাগলেন। স্বামীজী তাঁহার বক্তৃতারও খুব প্রশংসা করিলেন।

আহা! স্বামীজী বাস্তবিকই কাহারও দোষ দেখিতেন না। যাহার যেটুকু সামান্য গুণ বা শক্তি দেখিতেন, তাহাতেই উৎসাহ দিয়া যাহাতে তাহার ভিতরের অব্যক্ত শক্তিগুলি প্রকাশিত হয়, তাহারই চেষ্টা করিতেন। ... কোথায় পাইব এমন ব্যক্তি, যিনি শিষ্যবর্গকে লিখিতে পারেন, ' I want each one of my children to be a hundred times greater than I could ever be. Everyone of you must be a giant—must, that is my word!'—আমি

চাই তোমাদের প্রত্যেকে, আমি যাহা হইতে পারিতাম, তদপেক্ষা শতগুণে বড় হও। তোমাদের প্রত্যেককেই শূরবীর হইতে হইবে—হইতেই হইবে, নহিলে চলিবে না।

সেই সময়ে স্বামীজীর ইংলণ্ডে প্রদত্ত জ্ঞানযোগ-সম্বন্ধীয় বক্তৃতাসমূহ লণ্ডন হইতে ই.টি ষ্টার্ডি সাহেব কর্তৃক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইতেছে—মঠেও উহার দু-এক কপি প্রেরিত হইতেছে। স্বামীজী দার্জিলিঙ হইতে তখনও ফেরেন নাই—আমরা পরম আগ্রহ সহকারে সেই উদ্দীপনাপূর্ণ অদ্বৈততত্ত্বের অপূর্ব ব্যাখ্যাস্বরূপ বক্তৃতাগুলি পাঠ করিতেছি। বৃদ্ধ স্বামী অদ্বৈতানন্দ ভাল ইংরেজী জানেন না, কিন্তু তাঁহার বিশেষ আগ্রহ 'নরেন' বেদান্তসম্বন্ধে বিলাতে কি বলিয়া লোককে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহা শুনেন। তাঁহার অনুরোধে আমরা তাঁহাকে সেই পুস্তিকাগুলি পড়িয়া তাহার অনুবাদ করিয়া শুনাই। একদিন স্বামী প্রেমানন্দ নূতন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে বলিলেন, 'তোমরা স্বামীজীর এই বক্তৃতাগুলির বাঙলা অনুবাদ কর না।' তখন আমরা অনেকে নিজ নিজ ইচ্ছামত উক্ত pamphlet-গুলির মধ্যে যাহার যাহা ইচ্ছা সেইখানি পছন্দ করিয়া অনুবাদ আরম্ভ করিলাম। ইতোমধ্যে স্বামীজী আসিয়া পড়িয়াছেন। একদিন স্বামী প্রেমানন্দ স্বামীজীকে বলিলেন, 'এই ছেলেরা তোমার বক্তৃতাগুলির অনুবাদ আরম্ভ করেছে।' পরে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'তোমরা কে কি অনুবাদ করেছ, স্বামীজীকে শুনাও দেখি।' তখন সকলেই নিজ নিজ অনুবাদ আনিয়া কিছু কিছু স্বামীজীকে শুনাইল। স্বামীজীও অনুবাদ সম্বন্ধে দু-একটি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—এই শব্দের এইরূপ অনুবাদ হইলে ভাল হয়, এইরূপ দুই-একটি কথাও বলিলেন। একদিন স্বামীজীর কাছে কেবল আমিই রহিয়াছি, তিনি হঠাৎ আমায় বলিলেন, 'রাজযোগটা তর্জমা কর্ না।' আমার ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে এইরূপ আদেশ স্বামীজী কেন করিলেন? বহুদিন পূর্ব হইতেই আমি রাজযোগের অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতাম, ঐ যোগের উপর কিছুদিন এত অনুরাগ হইয়াছিল যে, ভক্তি জ্ঞান বা কর্মযোগকে একরূপ অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিতাম। মনে ভাবিতাম, মঠের সাধুরা যোগ-যাগ কিছু জানেন না, সেইজন্যই তাঁহারা যোগসাধনে উৎসাহ দেন না। স্বামীজীর 'রাজযোগ' গ্রন্থ পড়িয়া ধারণা হয় যে, স্বামীজী শুধু যে রাজযোগে বিশেষ পটু তাহা নহেন, উক্ত যোগ সম্বন্ধে আমার যে-সকল ধারণা ছিল, সে-সকল তো তিনি উত্তমরূপেই বুঝাইয়াছেন, তদ্ব্যতীত ভক্তি

জ্ঞান প্রভৃতি অন্যান্য যোগের সহিত রাজযোগের সম্বন্ধও অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। স্বামীজীর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার ইহা অন্যতম কারণ হইয়াছিল। রাজযোগের অনুবাদ করিলে উক্ত গ্রন্থের উত্তম চর্চা হইবে এবং তাহাতে আমারই আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা হইবে, তদুদ্দেশ্যেই কি তিনি আমাকে এই কার্যে প্রবৃত্ত করিলেন? অথবা বঙ্গদেশে যথার্থ রাজযোগের চর্চার অভাব দেখিয়া সর্বসাধারণের ভিতর উক্ত যোগের যথার্থ মর্ম প্রচার করিবার জন্যই তাঁহার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল? তিনি প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত একখানি পত্রে বলিয়াছেন, 'বাঙলা দেশে রাজযোগের চর্চার একান্ত অভাব—যাহা আছে, তাহা দমটানা ইত্যাদি বৈ আর কিছু নয়।'

যাহা হউক, স্বামীজীর আদেশে নিজের অনুপযুক্ততা প্রভৃতির কথা মনে না ভাবিয়া উহার অনুবাদে তখনই প্রবৃত্তি হইয়াছিলাম।

একদিন অপরাহ্নে একঘর লোক বসিয়া আছে, স্বামীজীর খেয়াল হইল, গীতা পাঠ করিতে হইবে। অমনি গীতা আনা হইল। সকলেই উদগ্রীব হইয়া স্বামীজী গীতা সম্বন্ধে কি বলেন, শুনিতে লাগিলেন। গীতা সম্বন্ধে সেদিন তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা দুই-চারি দিন পরেই স্বামী প্রেমানন্দের আদেশে স্মরণ করিয়া যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। তাহা 'গীতাতত্ত্ব' নামে প্রথমে 'উদ্বোধনে'র দ্বিতীয় বর্ষে প্রকাশিত হয় এবং পরে 'ভারতে বিবেকানন্দে'র অঙ্গীভূত করা হয়।৭

যখন স্বামীজী আলোচনা আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি একজন কঠোর সমালোচক—কৃষ্ণার্জুন, ব্যাস, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ-পরম্পরা যখন তন্নতন্নরূপে বিবৃত করিতে লাগিলেন, তখন সময়ে সময়ে বোধ হইতে লাগিল, এ ব্যক্তির নিকট অতি কঠোর সমালোচকও হার মানিয়া যায়। ঐতিহাসিক তত্ত্বের এইরূপ তীব্র বিশ্লেষণ করিলেন বটে, কিন্তু ঐ বিষয়ে স্বামীজী নিজ মতামত বিশেষভাবে কিছু প্রকাশ না করিয়াই পরে বুঝাইলেন, ধর্মের সঙ্গে এই ঐতিহাসিক গবেষণার কোন সম্পর্ক নাই। ঐতিহাসিক গবেষণায় শাস্ত্রবিবৃতি ব্যক্তিগণ কাল্পনিক প্রতিপন্ন হইলেও সনাতন ধর্মের অঙ্গে তাহাতে একটা আঁচড়ও লাগে না। আচ্ছা, যদি ধর্মসাধনের সঙ্গে ঐতিহাসিক

গবেষণার কোন সম্পর্ক না রহিল, তবে ঐতিহাসিক গবেষণার কি কোন মূল্য নাই?—এই প্রশ্নের সমাধানে স্বামীজী বুঝাইলেন, নির্ভীকভাবে এইসকল ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধানেরও একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। উদ্দেশ্য মহান্ হইলেও তজ্জন্য মিথ্যা ইতিহাস রচনা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বরং যদি লোকে সর্ববিষয়ে সত্যকে সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করে, তবে সে একদিন সত্যস্বরূপ ভগবানেরও সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। তারপর গীতার মূলতত্ত্বস্বরূপ সর্বমতসমন্বয় ও নিষ্কাম কর্মের ব্যাখ্যা সংক্ষেপে করিয়া শ্লোক পড়িতে আরম্ভ করিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' ইত্যাদি অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধার্থ উত্তেজনা-বাক্য পড়িয়া তিনি স্বয়ং সর্বসাধারণকে যেভাবে উপদেশ দেন, তাহা তাঁহার মনে পড়িল—'নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে', এ তো তোমার সাজে না—তুমি সর্বশক্তিমান্, তুমি ব্রহ্ম, তোমাতে যে নানারূপ ভাববিকৃতি দেখিতেছি—তাহা তো তোমার সাজে না। প্রফেটের মত ওজস্বিনী ভাষায় এই তত্ত্ব বলিতে বলিতে তাঁহার ভিতর হইতে যেন তেজ বাহির হইতে লাগিল। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, 'যখন অপরকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখতে হবে—তখন মহাপাপীকেও ঘৃণা করলে চলবে না। মহাপাপীকে ঘৃণা করো না'—এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর মুখের যে ভাবান্তর হইল, সেই ছবি আমার হৃদয়ে এখনও মুদ্রিত হইয়া আছে—যেন তাঁহার মুখ হইতে প্রেম শতধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মুখখানা যেন ভালবাসায় ডগমগ করিতেছে—তাহাতে কঠোরতার লেশমাত্র নাই।

এই একটি শ্লোকের মধ্যেই স্বামীজী সমগ্র গীতার সার নিহিত দেখাইয়া শেষে এই বলিয়া উপসংহার করিলেন, 'এই একটিমাত্র শ্লোক পড়লেই সমগ্র গীতাপাঠের ফল হয়।'

একদিন ব্রহ্মসূত্র আনিতে বলিলেন। বলিলেন, 'ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য না পড়ে এখন স্বাধীনভাবে সকলে সূত্রগুলির অর্থ বুঝবার চেষ্টা কর।' প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের সূত্রগুলি পড়া হইতে লাগিল। স্বামীজী যথাযথভাবে সংস্কৃত উচ্চারণ শিক্ষা দিতে লাগিলেন; বলিলেন, 'সংস্কৃত ভাষা আমরা ঠিক ঠিক উচ্চারণ করি না, অথচ এর উচ্চারণ এত সহজ যে, একটু চেষ্টা করলে সকলেই শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ করতে পারে। কেবল

আমরা ছেলেবেলা থেকে অন্যরূপ উচ্চারণে অভ্যস্ত হয়েছি—তাই ঐ-রকম উচ্চারণ এখন আমাদের এত বিসদৃশ ও কঠিন বোধ হয়। আমরা 'আত্মা' শব্দকে 'আত্‌মা' এইরূপ উচ্চারণ না করে 'আত্তাঁ' এইভাবে উচ্চারণ করি কেন? মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে বলেছেন, অপশব্দ-উচ্চারণকারীরা ম্লেচ্ছ। আমরা সকলেই তো পতঞ্জলির মতে ম্লেচ্ছ হয়েছি। তখন নূতন ব্রহ্মচারি-সন্ন্যাসিগণ এক এক করিয়া যথাসাধ্য ঠিক ঠিক উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের সূত্রগুলি পড়িতে লাগিলেন। পরে স্বামীজী যাহাতে সূত্রের প্রত্যেক শব্দটি ধরিয়া উহার অক্ষরার্থ করিতে পারা যায়, তাহার উপায় দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। বলিলেন, 'সূত্রগুলি যে কেবল অদ্বৈতমতেরই পোষক, এ-কথা কে বললে? শঙ্কর অদ্বৈতবাদী ছিলেন—তিনি সূত্রগুলিকে কেবল অদ্বৈতমতেই ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তোরা সূত্রের অক্ষরার্থ করবার চেষ্টা করবি—ব্যাসের যথার্থ অভিপ্রায় কি, বোঝবার চেষ্টা করবি—উদাহরণস্বরূপ দেখ্—'অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি'৮—এই সূত্রের ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা আমার মনে হয় যে, এতে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত উভয় বাদই ভগবান্ বেদব্যাস কর্তৃক সূচিত হয়েছে।'

স্বামীজী একদিকে যেমন গম্ভীরাত্মা ছিলেন, তেমনি অপরদিকে সুরসিকও ছিলেন। পড়িতে পড়িতে 'কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা' সূত্রটি আসিল। স্বামীজী এই সূত্রটি পাইয়াই স্বামী প্রেমানন্দের নিকট ইহার বিকৃত অর্থ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সূত্রটির প্রকৃত অর্থ এই—যখন উপনিষদে জগৎকারণের প্রসঙ্গ উঠাইয়া 'সোঽকাময়ত'—তিনি (সেই জগৎকারণ) কামনা করিলেন, এইরূপ কথা আছে, তখন 'অনুমানগম্য' (অচেতন) প্রধান বা প্রকৃতিকে জগৎকারণরূপে স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাহারা শাস্ত্রগ্রন্থের নিজ নিজ অদ্ভুত রুচি অনুযায়ী কদর্থ করিয়া এমন পবিত্র সনাতন ধর্মকে ঘোর বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে, যাহা কোন কালে গ্রন্থকারের অভিপ্রেত ছিল না, স্বামীজী কি তাহাদিগকে উপহাস করিতেছিলেন?

যাহা হউক, পাঠ চলিতে লাগিল। ক্রমে 'শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ'৯ সূত্র আসিল। এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া স্বামীজী প্রেমানন্দ স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,

'দেখ্, তোর ঠাকুরও যে নিজেকে ভগবান্ বলতেন, সে ঐ ভাবে বলতেন।' এই কথা বলিয়াই কিন্তু স্বামীজী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর নাভিশ্বাসের সময় বলেছিলেনঃ যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ, তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়।' এই বলিয়া আবার অন্য সূত্র পড়িতে বলিলেন।

স্বামীজীর অপার দয়া, তিনি আমাদিগকে সন্দেহ ত্যাগ করিতে বলেন নাই, ফস্ করিয়া কাহারও কথা বিশ্বাস করিতে বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, 'এই অদ্ভুত রামকৃষ্ণ চরিত্র তোমার ক্ষুদ্র বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে যতদূর সাধ্য আলোচনা কর, অধ্যয়ন কর—আমি তো তাঁহার লক্ষাংশের একাংশও এখনও বুঝতে পারিনি—ও যত বুঝবার চেষ্টা করবে, ততই সুখ পাবে, ততই মজবে।'

স্বামীজী একদিন আমাদের সকলকে ঠাকুরঘরে লইয়া গিয়া সাধনভজন শিখাইতে লাগিলেন। বলিলেন, 'প্রথম সকলে আসন করে বস্; ভাব—আমার আসন দৃঢ় হোক, এই আসন অচল অটল হোক, এর সাহায্যেই আমি ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হব।' সকলে বসিয়া কয়েক মিনিট এইরূপ চিন্তা করিলে তারপর বলিলেন, 'ভাব—আমার শরীর নীরোগ ও সুস্থ, বজ্রের মত দৃঢ়—এই দেহ-সহায়ে আমি সংসারের পারে যাব।' এইরূপ কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর ভাবিতে বলিলেন, 'এইরূপ ভাব্ যে, আমার নিকট হতে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ যাচ্ছে—হৃদয়ের ভিতর হতে সমগ্র জগতের জন্য শুভকামনা হচ্ছে—সকলের কল্যাণ হোক, সকলে সুস্থ ও নীরোগ হোক। এইরূপ ভাবনার পর কিছুক্ষণ প্রাণায়াম করবি; অধিক নয়, তিনটি প্রাণায়াম করলেই হবে। তারপর হৃদয়ে প্রত্যেকের নিজ নিজ ইষ্টমূর্তির চিন্তা ও মন্ত্রজপ—এইটি আধঘণ্টা আন্দাজ করবি।' সকলেই স্বামীজীর উপদেশমত চিন্তাদির চেষ্টা করিতে লাগিল।

এইভাবে সমবেত সাধনানুষ্ঠান মঠে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর আদেশে নূতন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে লইয়া বহুকাল যাবৎ 'এইবার চিন্তা কর, তারপর এইরূপ কর' বলিয়া দিয়া এবং স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া স্বামীজী-প্রোক্ত সাধন-প্রণালী অভ্যাস করাইয়াছিলেন।

* * *

একদিন সকালবেলা, ৯টা-১০টার সময় আমি একটা ঘরে বসিয়া কি করিতেছি—হঠাৎ তুলসী মহারাজ (স্বামী নির্মলানন্দ) আসিয়া বলিলেন, 'স্বামীজীর নিকট দীক্ষা নেবে?' আমিও বলিলাম, 'আজ্ঞা হাঁ।' ইতঃপূর্বে আমি কুলগুরু বা অপর কাহারও নিকট কোন প্রকার মন্ত্রগ্রহণ করি নাই। এক্ষণে নির্মলানন্দ স্বামীর এইরূপ অযাচিত আহ্বানে প্রাণে আর দ্বিধা রহিল না। 'লইব' বলিয়াই তাঁহার সঙ্গে ঠাকুরঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম। জানিতাম না যে, সেদিন শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী দীক্ষা লইতেছেন—তখনও দীক্ষাদান শেষ হয় নাই বলিয়া, বোধ হয় ঠাকুরঘরের বাহিরে একটু অপেক্ষাও করিতে হইয়াছিল। তারপর শরৎ বাবু বাহির হইয়া আসিবামাত্র তুলসী মহারাজ আমাকে লইয়া গিয়া স্বামীজীকে বলিলেন, 'এ দীক্ষা নেবে।' স্বামীজী আমাকে বসিতে বলিলেন। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোর সাকার ভাল লাগে, না নিরাকার ভাল লাগে?' আমি বলিলাম, 'কখনও সাকার ভাল লাগে, কখনও বা নিরাকার ভাল লাগে।'

তিনি ইহার উত্তরে বলিলেন, 'তা নয়; গুরু বুঝতে পারেন, কার কি পথ; হাতটা দেখি।' এই বলিয়া আমার দক্ষিণ হস্ত কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া অল্পক্ষণ যেন ধ্যান করিতে লাগিলেন। তারপর হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, 'তুই কখনও ঘটস্থাপনা করে পূজা করেছিস?' আমি বাড়ী ছাড়িবার কিছু পূর্বে ঘটস্থাপনা করিয়া কোন্ পূজা অনেকক্ষণ ধরিয়া করিয়াছিলাম—তাহা বলিলাম। তিনি তখন একটি দেবতার মন্ত্র বলিয়া দিয়া উহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, 'এই মন্ত্রে তোর সুবিধে হবে। আর ঘটস্থাপনা করে পূজা করলে তোর সুবিধা হবে।' তারপর আমার সম্বন্ধে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া পরে সম্মুখে কয়েকটি লিচু পড়িয়াছিল—সেইগুলি লইয়া আমায় গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ দিতে বলিলেন।

আমি দেখিলাম, যদি আমাকে ভগবচ্ছক্তিস্বরূপ কোন দেবতার উপাসনা করিতে হয়, তবে স্বামীজী যে দেবতার কথা আমায় উপদেশ দিলেন, তাহাই আমার সম্পূর্ণ প্রকৃতিসঙ্গত।

শুনিয়াছিলাম, যথার্থ গুরু শিষ্যের প্রকৃতি বুঝিয়া মন্ত্র দেন, স্বামীজীতে আজ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম।

দীক্ষাগ্রহণের কিছু পরে স্বামীজীর আহার হইল। স্বামীজীর ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ আমি ও শরৎবাবু উভয়েই ধারণ করিলাম।

মঠে তখন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন-সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান মিরর'; নামক ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র বিনামূল্যে প্রদত্ত হইত, কিন্তু মঠের সন্ন্যাসীদের এরূপ সংস্থান ছিল না যে, উহার ডাকখরচটা দেন। উক্ত পত্র পিয়ন দ্বারা বরাহনগর পর্যন্ত বিলি হইত। বরাহনগরে 'দেবালয়ে'র প্রতিষ্ঠাতা সেবাব্রতী শ্রীশশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত একটি বিধবাশ্রম ছিল। তথায় একখানি করিয়া ঐ আশ্রমের জন্য উক্ত পত্র আসিত। 'ইণ্ডিয়ান মিররে'র পিয়নের ঐ পর্যন্ত 'বিট' বলিয়া মঠের কাগজখানিও ঐখানে আসিত এবং তথা হইতে উহা প্রত্যহ মঠে লইয়া আসিতে হইত। উক্ত বিধবাশ্রমের উপর স্বামীজীর যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে তাঁহার আমেরিকায় অবস্থানকালে এই আশ্রমের সাহায্যের জন্য স্বামীজী একটি benefit বক্তৃতা দেন এবং উক্ত বক্তৃতার টিকিট বেচিয়া যাহা কিছু আয় হয়, তাহা এই আশ্রমেই প্রদত্ত হয়। যাহা হউক, তখন মঠের বাজার করা, ঠাকুর-সেবার আয়োজন প্রভৃতি সমুদয় কার্যই কানাই মহারাজ বা স্বামী নির্ভয়ানন্দকে করিতে হইত। বলা বাহুল্য, এই 'ইণ্ডিয়ান মিরর' কাগজ আনার ভারও তাঁহার উপরেই ছিল। তখন আমরা মঠে অনেকগুলি নবদীক্ষিত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী জুটিয়াছি, কিন্তু তখনও মঠের প্রয়োজনীয় সমুদয় কর্মের একটা প্রণালীপূর্বক বিভাগ করিয়া সকলের উপর অল্পাধিক পরিমাণে কাজের ভার দেওয়া হয় নাই। সুতরাং নির্ভয়ানন্দ স্বামীকে যথেষ্ট কার্য করিতে হইতেছে। তাঁহারও তাই মনে হইয়াছে যে, তাঁহার কর্তব্য কার্যগুলির ভিতর কিছু কিছু যদি নূতন সাধুদের উপর দিতে পারেন, তবে তাঁহার কতকটা অবকাশ হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি আমাকে বলিলেন, 'যেখানে ইণ্ডিয়ান মিরর আসে, তোমাকে সে স্থান দেখিয়া আনব—তুমি রোজ গিয়ে কাগজখানি এন।' আমিও ইহা অতি সহজ কাজ জানিয়া এবং উহাতে একজনের কার্যভারের কিঞ্চিৎ লাঘব হইবে ভাবিয়া সহজেই স্বীকৃত

হইলাম। একদিন দ্বিপ্রহরের প্রসাদ-ধারণান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর নির্ভয়ানন্দ আমাকে বলিলেন, 'চল, সেই বিধবাশ্রমটি তোমায় দেখিয়ে দিই।' আমিও তাঁহার সহিত যাইতে উদ্যত হইয়াছি, ইতোমধ্যে স্বামীজী দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'বেদান্তপাঠ করা যাক–আয়।' আমি অমুক কার্যে যাইতেছি–বলায় আর কিছু বলিলেন না। আমি কানাই মহারাজের সহিত বাহির হইয়া সেইস্থান চিনিয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিয়া মঠে আমাদের জনৈক ব্রহ্মচারী বন্ধুর নিকট শুনিলাম, আমি চলিয়া যাইবার কিছু পরে স্বামীজী অপরের নিকট বলিতেছিলেন, 'ছোঁড়াটা গেল কোথায়? স্ত্রীলোক দেখতে গেল নাকি?' এ কথা শুনিয়াই আমি কানাই মহারাজকে বলিলাম, 'ভাই, চিনে এলুম বটে, কিন্তু কাগজ আনতে সেখানে আমার আর যাওয়া হবে না।'

শিষ্যগণের–বিশেষতঃ নূতন নূতন ব্রহ্মচারিগণের যাহাতে চরিত্ররক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে স্বামীজী এত সাবধান ছিলেন। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত মঠের কোন সাধু-ব্রহ্মচারী কলিকাতায় বাস করে বা রাত কাটায়–ইহা তাঁহার আদৌ অভিপ্রেত ছিল না, বিশেষ যেখানে স্ত্রীলোকদের সংস্পর্শে আসিতে হয়। ইহার শত শত উদাহরণ দেখিয়াছি।

যেদিন মঠ হইতে রওনা হইয়া আলমোড়া যাত্রার জন্য কলিকাতা যাইবেন, সেদিন সিঁড়ির পাশে বারান্দায় দাঁড়াইয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত নূতন ব্রহ্মচারিগণকে সম্বোধন করিয়া ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আমার কানে এখনও বাজিতেছেঃ

দেখ্ বাবা, ব্রহ্মচর্য ব্যতীত কিছু হবে না। ধর্মজীবন লাভ করতে হলে ব্রহ্মচর্যই তার একমাত্র সহায়। তোরা স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে একদম আসবি না। আমি তোদের স্ত্রীলোকদের ঘেন্না করতে বলছি না, তারা সাক্ষাৎ ভগবতীস্বরূপা, কিন্তু নিজেদের বাঁচাবার জন্যে তাদের কাছ থেকে তোদের তফাত থাকতে বলছি। তোরা যে আমার লেকচারে ে◌ছিস–'সংসারে থেকেও ধর্ম হয়' অনেক জায়গায় বলেছি, তাতে মনে করিসনি যে, আমার মতে ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাস ধর্মজীবনের জন্য অত্যাবশ্যক নয়। কি করব, সে-সব লেকচারের শ্রোতৃমণ্ডলী সব সংসারী, সব গৃহী–তাদের কাছে যদি পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের কথা একেবারে বলি, তবে তার পরদিন থেকে আর কেউ আমার লেকচারে আসত না।

তাদের মতে কতকটা সায় দিয়ে যাতে তাদের ক্রমশঃ পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের দিকে ঝোঁক হয়, সেইজন্যই ঐ ভাবে লেকচার দিয়েছি। কিন্তু আমার ভেতরের কথা তোদের বলছি—ব্রহ্মচর্য ছাড়া এতটুকুও ধর্মলাভ হবে না। কায়মনোবাক্যে তোরা এই ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করবি।

* * *

একদিন বিলাত হইতে কি একখানা চিঠি আসিয়াছে, সেই চিঠিখানি পড়িয়া সেই প্রসঙ্গে ধর্মপ্রচারকের কি কি গুণ থাকিলে সে কৃতকার্য হইতে পারে, বলিতে লাগিলেন। নিজের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ ধর্মপ্রচারকের এই এই গুলি খোলা থাকা আবশ্যক, এবং এই এই গুলি বন্ধ থাকা প্রয়োজন। তাহার মাথা, হৃদয় ও মুখ খোলা থাকা আবশ্যক, তাহার প্রবল মেধাবী হৃদয়বান্ ও বাগ্মী হওয়া উচিত, আর তাহার অধোদেশের কার্য যেন বন্ধ থাকে—যেন সে পূর্ণ ব্রহ্মচর্যবান্ হয়। জনৈক প্রচারককে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, তাহার অন্যান্য সমুদয় গুণ আছে, কেবল একটু হৃদয়ের অভাব—যাহা হউক, ক্রমে হৃদয়ও খুলিয়া যাইবে।

সেই পত্রে মিস নোবল্১০ বিলাত হইতে শীঘ্র ভারতে রওনা হইবেন, এই সংবাদ ছিল। মিস নোবলের প্রশংসায় স্বামীজী শতমুখ হইলেন, বলিলেন, 'বিলেতের ভেতর এমন পূতচরিতা, মহানুভবা নারী খুব কম। আমি যদি কাল মরে যাই, এ আমার কাজ বজায় রাখবে।' স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল।

* *

বেদান্তের শ্রীভাষ্যের ইংরেজী অনুবাদক, স্বামীজীর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রের প্রধান লেখক, মান্দ্রাজের বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রঙ্গাচার্য তীর্থভ্রমণোপলক্ষে শীঘ্র কলিকাতায় আসিবেন, স্বামীজীর নিকট পত্র আসিয়াছে। স্বামীজী মধ্যাহ্নে আমাকে বলিলেন, 'চিঠির কাগজ কলম এনে লেখ্ দিকি; আর একটু খাবার জল নিয়ে আয়।' আমি এক গ্লাস জল স্বামীজীকে দিয়া ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে বলিলাম, 'আমার হাতের লেখা তত ভাল নয়।' আমি মনে করিয়াছিলাম, বিলাত বা

আমেরিকায় কোন চিঠি লিখিতে হইবে। স্বামীজী অভয় দিয়া বলিলেন, 'লেখ্, foreign letter (বিলাতী চিঠি) নয়।' তখন আমি কাগজ কলম লইয়া চিঠি লিখিতে বসিলাম। স্বামীজী ইংরেজীতে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, আমি লিখিতে লাগিলাম। অধ্যাপক রঙ্গাচার্যকে একখানি লেখাইলেন; আর একখানি পত্রও লেখাইয়াছিলেন কাহাকে—ঠিক মনে নাই। মনে আছে রঙ্গাচার্যকে অন্যান্য কথার ভিতর এই কথা লেখাইয়াছিলেন—বাঙলা দেশে বেদান্তের তেমন চর্চা নাই, অতএব আপনি যখন কলিকাতায় আসিতেছেন, তখন ' give a rub to the people of Calcutta'—কলিকাতাবাসীকে একটু উসকাইয়া দিয়া যান। কলিকাতায় যাহাতে বেদান্তের চর্চা বাড়ে, কলিকাতাবাসী যাহাতে একটু সচেতন হয়, তজ্জন্য স্বামীজীর কী দৃষ্টি ছিল! নিজের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে চিকিৎসকগণের সনির্বন্ধ অনুরোধে স্বামীজী কলিকাতায় দুইটি মাত্র বক্তৃতা দিয়াই স্বয়ং বক্তৃতাদানে বিরত হইয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি যখনই সুবিধা পাইতেন তখনই কলিকাতাবাসীর ধর্মভাব জাগরিত করিবার চেষ্টা করিতেন। স্বামীজীর এই পত্রের ফলেই ইহার কিছুকাল পরে কলিকাতাবাসিগণ ষ্টার-রঙ্গমঞ্চে উক্ত পণ্ডিতবরের ' The Priest and the Prophet' (পুরোহিত ও ঋষি) নামক সারগর্ভ বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল।

* * *

একটি বয়স্ক বাঙালী যুবক এই সময় মঠে আসিয়া তথায় সাধুরূপে বাস করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। স্বামীজী ও মঠের অন্যান্য সাধুবর্গ তাহার চরিত্র পূর্ব হইতেই বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তাহাকে আশ্রম-জীবনের অনুপযুক্ত জানিয়া কেহই তাহাকে মঠভুক্ত করিতে সম্মত ছিলেন না। তাহার পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, 'মঠে যে-সকল সাধু আছেন, তাঁদের সকলের যদি মত হয়, তবে তোমায় রাখতে পারি।' এই কথা বলিয়া পুরাতন সাধুবর্গকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'একে মঠে রাখতে তোমাদের কার কিরূপ মত?' তখন সকলেই একবাক্যে তাহাকে রাখিতে অমত প্রকাশ করিলে উক্ত যুবককে আর মঠে রাখা হইল না।

* * *

একদিন অপরাহ্নে স্বামীজী মঠের বারান্দায় আমাদিগের সকলকে লইয়া বেদান্ত পড়াইতে বসিয়াছেন—সন্ধ্যা হয় হয়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ইহার কিছুকাল পূর্বে প্রচার-কার্যের জন্য স্বামীজী কর্তৃক মান্দ্রাজে প্রেরিত হওয়ায় তাঁহার অপর একজন গুরুভ্রাতা তখন মঠে পূজা আরাত্রিকাদি কার্যভার লইয়াছেন। আরাত্রিকাদি কার্যে যাহারা তাঁহাকে সাহায্য করিত, তাহাদিগকেও লইয়া স্বামীজী বেদান্ত পড়াইতে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ উক্ত গুরুভ্রাতা আসিয়া নূতন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে বলিলেন, 'চল হে চল, আরতি করতে হবে, চল।' তখন একদিকে স্বামীজীর আদেশে সকলে বেদান্তপাঠে নিযুক্ত, অপর দিকে ইঁহার আদেশে ঠাকুরের আরাত্রিকে যোগদান করিতে হইবে—নূতন সাধুরা একটু গোলে পড়িয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তখন স্বামীজী তাঁহার ঐ গুরুভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিলেন, 'এই যে বেদান্ত পড়া হচ্ছিল, এটা কি ঠাকুরের পূজা নয়? কেবল একখানা ছবির সামনে সলতে-পোড়া নাড়লে আর ঝাঁজ পিটলেই মনে করছিস বুঝি ভগবানের যথার্থ আরাধনা হয়? তোরা অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি—।' এইরূপ বলিতে বলিতে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে উক্তরূপে বেদান্তপাঠে ব্যাঘাত দেওয়াতে আরও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ফলে বেদান্তপাঠ বন্ধ হইয়া গেল—কিছুক্ষণ পরে আরতিও শেষ হইল। আরতির পরে কিন্তু উক্ত গুরুভ্রাতাকে আর কেহ দেখিতে পাইল না, তখন স্বামীজীও অতিশয় ব্যাকুল হইয়া 'সে কোথায় গেল, সে কি আমার গালাগাল খেয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে গেল?'—ইত্যাদি বলিতে বলিতে সকলকেই চতুর্দিকে তাঁহার অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। বহুক্ষণ পরে তাঁহাকে মঠের উপরের ছাদে চিন্তান্বিত ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া স্বামীজীর নিকট লইয়া আসা হইল। তখন স্বামীজীর ভাব সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহাকে কত যত্ন করিলেন, তাঁহাকে কত মিষ্ট কথা বলিতে লাগিলেন! গুরুভাই-এর প্রতি স্বামীজীর অপূর্ব ভালবাসা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বুঝিলাম, গুরুভাইগণের উপর স্বামীজীর অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা। কেবল যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের নিষ্ঠা বজায় রাখিয়া উদারতর হইতে পারেন, ইহাই তাঁহার বিশেষ চেষ্টা। পরে স্বামীজীর মুখে অনেকবার শুনিয়াছি, যাঁহাকে স্বামীজী বেশী গালাগাল দিতেন, তিনিই তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র।

* * *

একদিন বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি আমাকে বলিলেন, ‘দেখ্, মঠের একটা ডায়েরী রাখবি, আর হপ্তায় হপ্তায় মঠের একটা করে রিপোর্ট পাঠাবি।’ স্বামীজীর এই আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছিল।

২. স্বামীজীর কথা

স্বামীজীর কথা

আমি নিজে অবশ্য বেদের ততটুকু মানি, যতটুকু যুক্তির সঙ্গে মেলে। বেদের অনেক অংশ তো স্পষ্টই স্ববিরোধী। Inspired বা প্রত্যাদিষ্ট বলতে পাশ্চাত্যদেশে যেরূপ বুঝায়, বেদকে আমাদের শাস্ত্রে সেরূপভাবে প্রত্যাদিষ্ট বলে না। তবে উহা কি? না, ভগবানের সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টি। এই জ্ঞানসমষ্টি যুগারম্ভে প্রকাশিত বা ব্যক্ত এবং যুগাবসানে সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত ভাব ধারণ করে। যুগের আরম্ভ হলে উহা আবার প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রের এই কথাগুলি অবশ্য ঠিক, কিন্তু কেবল 'বেদ' নামধেয় গ্রন্থগুলিই এই জ্ঞানসমষ্টি, এ কথা মনকে আঁখিঠারা মাত্র। মনু এক স্থলে বলেছেন, বেদের যে অংশ যুক্তির সঙ্গে মেলে তাই বেদ, অপরাংশ বেদ নয়। আমাদের অনেক দার্শনিকেরও এই মত।

অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে যত তর্ক-বিতর্ক হয়ে থাকে, তার মোদ্দা কথা এই যে, এতে ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগের স্থান নেই। আমরা আনন্দের সঙ্গে এ কথা স্বীকার করতে খুব প্রস্তুত আছি।

বেদান্তের প্রথম কথা হচ্ছে—সংসার দুঃখময়, শোকের আগার, অনিত্য ইত্যাদি। বেদান্ত প্রথম খুললেই 'দুঃখ দুঃখ' শুনে লোক অস্থির হয়, কিন্তু তার শেষে পরম সুখ—যথার্থ সুখের কথা পাওয়া যায়। বিষয়-জগৎ, ইন্দ্রিয়-জগৎ থেকে যে যথার্থ সুখ হতে পারে, এ কথা আমরা অস্বীকার করি, আর বলি ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুতেই যথার্থ সুখ। আর এই সুখ, এই আনন্দ সব মানুষের ভেতরেই আছে। আমরা জগতে যে 'সুখবাদ' দেখতে পাই, যে মতে বলে—জগৎটা পরম সুখের স্থান, তাতে মানুষকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ করে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যায়।

আমাদের দর্শনে ত্যাগের বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। বাস্তবিক ত্যাগ ব্যতীত আমাদের কোন দর্শনেরই লক্ষ্য বস্তু পাওয়া অসম্ভব। কারণ ত্যাগ মানেই হচ্ছে—আসল সত্য যে

আত্মা, তার প্রকাশের সাহায্য করা। উহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে একেবারে উড়িয়ে দিতে চায়, তার ভাব এই যে, সে সত্য-জগতের জ্ঞান লাভ করে।

জগতে যত শাস্ত্র আছে, তার মধ্যে বেদই কেবল বলেন যে, বেদপাঠ—অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যা হচ্ছে, যার দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়। সে পড়েও হয় না, বিশ্বাস করেও হয় না, তর্ক করেও হয় না, সমাধি-অবস্থা লাভ করলে তবে সেই পরমপুরুষকে জানা যায়।

জ্ঞানলাভ হলে আর সাম্প্রদায়িকতা থাকে না; তা বলে জ্ঞানী কোন সম্প্রদায়কে যে ঘৃণা করেন, তা নয়। সব নদী যেমন সমুদ্রে গিয়ে পড়ে এবং এক হয়ে যায়, সেইরূপ সব সম্প্রদায়—সব মতেই জ্ঞান লাভ হয়, তখন আর কোন মতভেদ থাকে না।

জ্ঞানী বলেন, সংসার ত্যাগ করতে হবে। তার মানে এ নয় যে, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে ভাসিয়ে বনে চলে যেতে হবে। প্রকৃত ত্যাগ হচ্ছে সংসারে অনাসক্ত হয়ে থাকা।

মানুষের পুনঃ পুনঃ জন্ম কেন হয়? পুনঃ পুনঃ শরীর-ধারণে দেহমনের বিকাশ হবার সুবিধে হয়, আর ভেতরের ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ হতে থাকে।

বেদান্ত মানুষের বিচার-শক্তিকে যথেষ্ট আদর করে থাকেন বটে, কিন্তু আবার এও বলেন যে, যুক্তি-বিচারের চেয়েও বড় জিনিষ আছে।

ভক্তিলাভ কিরূপে হয়?—ভক্তি তোমার ভেতরেই আছে, কেবল তার ওপর কামকাঞ্চনের একটা আবরণ পড়ে রয়েছে, তা সরিয়ে ফেললেই ভক্তি আপনা-আপনি প্রকাশ হবে।

জিব চললেই অন্যান্য ইন্দ্রিয় চলবে।

জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম—এই চার রাস্তা দিয়েই মুক্তিলাভ হয়। যে যে-পথের উপযুক্ত, তাকে সেই পথ দিয়েই যেতে হবে, কিন্তু বর্তমান কালে কর্মযোগের ওপর একটু বিশেষ ঝোঁক দিতে হবে।

ধর্ম একটা কল্পনার জিনিষ নয়, প্রত্যক্ষ জিনিষ। যে একটা ভূতও দেখেছে, সে অনেক বই-পড়া পণ্ডিতের চেয়ে বড়।

এক সময়ে স্বামীজী কোন লোকের খুব প্রশংসা করেন, তাতে তাঁর নিকটস্থ জনৈক ব্যক্তি বলেন, 'কিন্তু সে আপনাকে মানে না।' তাতে তিনি বলে উঠলেন, 'আমাকে মানতে হবে, এমন কিছু লেখাপড়া আছে? সে ভাল কাজ করছে, এই জন্যে সে প্রশংসার পাত্র।'

আসল ধর্মের রাজ্য যেখানে, সেখানে লেখাপড়ার প্রবেশাধিকার নেই।

কেউ কেউ বলেন, আগে সাধন-ভজন করে সিদ্ধ হও, তারপর কর্ম করবার অধিকার; কেউ কেউ বা বলেন, গোড়া থেকেই কর্ম করতে হবে। এর সামঞ্জস্য কোথায়?

তোমরা দুটো জিনিষ গোল করে ফেলছ। কর্ম মানে—এক জীব-সেবা, আর এক প্রচার। প্রকৃত প্রচারে অবশ্য সিদ্ধপুরুষ ছাড়া কারও অধিকার নেই। সেবায় কিন্তু সকলের অধিকার; শুধু অধিকার নয়, সেবা করতে সকলে বাধ্য, যতক্ষণ তারা অপরের সেবা নিচ্ছে।

ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভেতর যেদিন থেকে বড়লোকের খাতির আরম্ভ হবে, সেই দিন থেকে তার পতন আরম্ভ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে ভাবের (feelings) যেরূপ বিকাশ হয়েছিল, এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না।

অসৎ কর্ম করতে ইচ্ছা হয়, গুরুজনের সামনে করবে।

গোঁড়ামি দ্বারা খুব শীঘ্র ধর্ম-প্রচার হয় বটে, কিন্তু সকলকে মতের স্বাধীনতা দিয়ে একটা উচ্চপথে তুলে দিতে দেরী হলেও পাকা ধর্মপ্রচার হয়।

]

সাধনের জন্য যদি শরীর যায়, গেলই বা।

সাধুসঙ্গে থাকতে থাকতেই (ধর্মলাভ) হয়ে যাবে।

গুরুর আশীর্বাদে শিষ্য না পড়েও পণ্ডিত হয়ে যায়।

গুরু কাকে বলা যায়?—যিনি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু।

আচার্য যে-সে হতে পারেন না, কিন্তু মুক্ত অনেকে হতে পারে। মুক্ত যে, তার কাছে সমুদয় জগৎ স্বপ্নবৎ, কিন্তু আচার্যকে উভয় অবস্থার মাঝখানে থাকতে হয়। তাঁর জগৎকে সত্য জ্ঞান করা চাই, না হলে তিনি কেন উপদেশ দেবেন? আর যদি তাঁর স্বপ্নজ্ঞান না হল, তবে তিনি তো সাধারণ লোকের মত হয়ে গেলেন, তিনি কি শিক্ষা দেবেন? আচার্যকে শিষ্যের পাপের ভার নিতে হয়। তাতেই শক্তিমান্ আচার্যদের শরীরে ব্যাধি-আদি হয়। কিন্তু কাঁচা হলে তাঁর মনকে পর্যন্ত তারা আক্রমণ করে, তিনি পড়ে যান। আচার্য—যে-সে হতে পারে না।

এমন সময় আসবে, যখন এক ছিলিম তামাক সেজে লোককে সেবা করা কোটি কোটি ধ্যানের চেয়ে বড় বলে বুঝতে পারবে।

৩. স্বামীজীর সহিত কয়েক দিন

স্বামীজীর সহিত কয়েক দিন

বেলগাঁ—১৮৯২ খ্রীঃ ১৮ অক্টোবর, মঙ্গলবার। প্রায় দুই ঘণ্টা হইল সন্ধ্যা হইয়াছে। এক স্থূলকায় প্রসন্নবদন যুবা সন্ন্যাসী আমার পরিচিত জনৈক দেশীয় উকিলের সহিত আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উকিল বন্ধুটি বলিলেন, 'ইনি একজন বিদ্বান্ বাঙালী সন্ন্যাসী, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।' ফিরিয়া দেখিলাম—প্রশান্তমূর্তি, দুই চক্ষু হইতে যেন বিদ্যুতের আলো বাহির হইতেছে। গোঁফদাড়ি কামান, অঙ্গে গেরুয়া আলখাল্লা, পায়ে মহারাষ্ট্রীয় দেশের বাহানা চটিজুতা, মাথায় গেরুয়া কাপড়েরই পাগড়ি। সন্ন্যাসীর সে অপরূপ মূর্তি স্মরণ হইলে এখনও যেন তাঁহাকে চোখের সামনে দেখি।

কিছুক্ষণ পরে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয় কি তামাক খান? আমি কায়স্থ, আমার একটি ভিন্ন আর হুঁকা নাই। আপনার যদি আমার হুঁকায় তামাক খাইতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে তামাক সাজিয়া দিতে বলি।' তিনি বলিলেন, 'তামাক চুরুট—যখন যাহা পাই, তখন তাহাই খাইয়া থাকি, আর আপনার হুঁকায় খাইতে কিছুই আপত্তি নাই।' তামাক সাজাইয়া দিলাম।

তাঁহাকে আমার বাসায় থাকিতে বলিলাম ও তাঁহার জিনিষপত্র আমার বাসায় আনাইব কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'আমি উকিল বাবুর বাড়ীতে বেশ আছি। আর বাঙালী দেখিয়াই তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলে তাঁহার মনে দুঃখ হইবে; কারণ তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত স্নেহ ও ভক্তি করেন—অতএব আসিবার বিষয় পরে বিবেচনা করা যাইবে।'

সে রাত্রে বড় বেশি কথাবার্তা হইল না; কিন্তু দুই-চারিটি কথা যাহা বলিলেন, তাহাতেই বেশ বুঝিলাম, তিনি আমা অপেক্ষা হাজারগুণে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্; ইচ্ছা করিলে অনেক

টাকা উপার্জন করিতে পারেন, তথাপি টাকাকড়ি ছোঁন না, এবং সুখী হইবার সমস্ত বিষয়ের অভাব সত্ত্বেও আমা অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী।

আমার বাসায় থাকিবেন না জানিয়া পুনরায় বলিলাম, 'যদি চা খাইবার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে কল্য প্রাতে আমার সহিত চা খাইতে আসিলে সুখী হইব।' তিনি আসিতে স্বীকার করিলেন এবং উকিলটির সহিত তাঁহার বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। রাত্রে তাঁহার বিষয় অনেক ভাবিলাম; মনে হইল—এমন নিস্পৃহ, চিরসুখী, সদা সন্তুষ্ট, প্রফুল্লমুখ পুরুষ তো কখনও দেখি

পরদিন ১৯ অক্টোবর। প্রাতে ৬টার সময় উঠিয়া স্বামীজীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে আটটা বাজিয়া গেল, কিন্তু স্বামীজীর দেখা নাই। আর অপেক্ষা না করিয়া একটি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজী যেখানে ছিলেন সেখানে গেলাম। গিয়া দেখি এক মহাসভা; স্বামীজী বসিয়া আছেন এবং নিকটে অনেক সম্ভ্রান্ত উকিল ও বিদ্বান্ লোকের সহিত কথাবার্তা চলিতেছে। স্বামীজী কাহারও সহিত ইংরেজীতে, কাহারও সহিত সংস্কৃতে এবং কাহারও সহিত হিন্দুস্থানীতে তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর একটুমাত্র চিন্তা না করিয়াই একেবারে দিতেছেন। আমার ন্যায় কেহ কেহ হক্স্লির ফিলজফিকে প্রামাণিক মনে করিয়া তদবলম্বনে স্বামীজীর সহিত তর্ক করিতে উদ্যত। তিনি কিন্তু কাহাকেও ঠাট্টাচ্ছলে, কাহাকেও গম্ভীরভাবে যথাযথ উত্তর দিয়া সকলকেই নিরস্ত করিতেছেন। আমি যাইয়া প্রণাম করিলাম এবং অবাক হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। ভাবিতে লাগিলাম—ইনি কি মনুষ্য, না দেবতা?

কোন গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ উকিল প্রশ্ন করিলেন, 'স্বামীজী, সন্ধ্যা আহ্নিক প্রভৃতির মন্ত্রাদি সংস্কৃতভাষায় রচিত; আমরা সেগুলি বুঝি না। আমাদের ঐ-সকল মন্ত্রোচ্চারণে কিছু ফল আছে কি?'

স্বামীজী উত্তর করিলেন 'অবশ্যই উত্তম ফল আছে। ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া ঐ কয়টি সংস্কৃত মন্ত্রাদি তো ইচ্ছা করিলে অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পার, তথাপি লও না। ইহা

কাহার দোষ? আর যদি মন্ত্রের অর্থ নাই বুঝিতে পার, যখন সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতে বস, তখন ধর্ম-কর্ম করিতেছি মনে কর, না—কিছু পাপ করিতেছি মনে কর? যদি ধর্ম-কর্ম করিতেছি মনে করিয়া বস, তাহা হইলে উত্তম ফল লাভ করিতে উহাই যে যথেষ্ট।'

অন্য একজন এই সময়ে সংস্কৃতে বলিলেন, 'ধর্ম সম্বন্ধে কথোপকথন ম্লেচ্ছভাষায় করা উচিত নহে; অমুক পুরাণে লেখা আছে।'

স্বামীজী উত্তর করিলেন, 'যে-কোন ভাষাতেই হোক ধর্মচর্চা করা যায়' এবং এই বাক্যের সমর্থনে শ্রুতি প্রভৃতির বচন প্রমাণস্বরূপ দিয়া বলিলেন, 'হাইকোর্টের নিষ্পত্তি নিম্ন আদালত দ্বারা খণ্ডন হইতে পারে না।'

এইরূপে নয়টা বাজিয়া গেল। যাঁহাদের অফিস বা কোর্টে যাইতে হইবে, তাঁহারা চলিয়া গেলেন, কেহ বা তখনও বসিয়া রহিলেন। স্বামীজীর দৃষ্টি আমার উপর পড়ায়, পূর্বদিনের চা খাইতে যাবার কথা স্মরণ হওয়ায় বলিলেন, 'বাবা, অনেক লোকের মন ক্ষুণ্ণ করিয়া যাইতে পারি নাই, মনে কিছু করিও না।' পরে আমি তাঁহাকে আমার বাসায় আসিয়া থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করায় অবশেষে বলিলেন, 'আমি যাঁহার অতিথি, তাঁহার মত করিতে পারিলে আমি তোমারই নিকট থাকিতে প্রস্তুত।' উকিলটিকে বিশেষ বুঝাইয়া স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়া আমার বাসায় আসিলাম। সঙ্গে মাত্র একটি কমণ্ডলু ও গেরুয়া কাপড়ে বাঁধা একখানি পুস্তক। স্বামীজী তখন ফ্রান্স দেশের সঙ্গীত সম্বন্ধে একখানি পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন। পরে বাসায় আসিয়া দশটার সময় চা খাওয়া হইল; তাহার পরেই আবার একগ্লাস ঠাণ্ডা জলও চাহিয়া খাইলেন। আমার নিজের মনে যে-সমস্ত কঠিন সমস্যা ছিল, সে-সকল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সহসা ভরসা হইতেছে না বুঝিতে পারিয়া তিনি নিজেই আমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দুই কথাতেই বুঝিয়া লইলেন।

ইতঃপূর্বে 'টাইমস্' সংবাদপত্রে একজন একটি সুন্দর কবিতায় 'ঈশ্বর কি?' 'কোন্ ধর্ম সত্য?' প্রভৃতি তত্ত্ব বুঝিয়া ওঠা অত্যন্ত কঠিন, লিখিয়াছেন; সেই কবিতাটি আমার তখনকার ধর্মবিশ্বাসের সহিত ঠিক মিলিয়া যাওয়ায় আমি উহা যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম;

তাহাই তাঁহাকে পড়িতে দিলাম। পড়িয়া তিনি বলিলেন, 'লোকটা গোলমালে পড়িয়াছে।' আমারও ক্রমে সাহস বাড়িতে লাগিল। 'ঈশ্বর দয়াময় ও ন্যায়বান্, এককালে দুই-ই হইতে পারেন না'—খ্রীষ্টান মিশনরীদের সহিত এই তর্কের মীমাংসা হয় নাই; মনে করিলাম, এ সমস্যাপূরণ স্বামীজীও করিতে পারিবেন না।

স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'তুমি তো Science (বিজ্ঞান) অনেক পড়িয়াছ, দেখিতেছি। প্রত্যেক জড়পদার্থে দুইটি opposite forces—centripetal and centrifugal কি act করে না? যদি দুইটি opposite forces (বিপরীত শক্তি) জড়বস্তুতে থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে দয়া ও ন্যায় opposite (বিপরীত) হইলেও কি ঈশ্বরে থাকা সম্ভব নয়? ALL I can say is that you have a very poor idea of your God.'

আমি তো নিস্তব্ধ। আমার পূর্ণ বিশ্বাস— Truth is absolute (সত্য নিরপেক্ষ)। সমস্ত ধর্ম কখনও এককালে সত্য হইতে পারে না। তিনি সে-সব প্রশ্নের উত্তরে বলিলেনঃ

আমরা যে বিষয়ে যাহা কিছু সত্য বলিয়া জানি বা পরে জানিব, সে-সকলই আপেক্ষিক সত্য (Relative truths). Absolute truth-এর (নিরপেক্ষ সত্যের) ধারণা করা আমাদের সীমাবদ্ধ মন-বুদ্ধির পক্ষে অসম্ভব। অতএব সত্য Absolute (নিরপেক্ষ) হইলেও বিভিন্ন মন-বুদ্ধির নিকট বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়। সত্যের সেই বিভিন্ন আকার বা ভাবগুলি নিত্য (Absolute) সত্যকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত থাকে বলিয়া সে সকলগুলিই এক দরের বা এক শ্রেণীর। যেমন দূর এবং সন্নিকট স্থান হইতে photograph (ফটো) লইলে একই সূর্যের ছবি নানরূপ দেখায়, মনে হয়—প্রত্যেক ছবিটাই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন সূর্যের—তদ্রূপ। আপেক্ষিক সত্য (Relative truth)-সকল, নিত্য সত্যের (Absolute truth) সম্পর্কে ঠিক ঐ ভাবে অবস্থিত। প্রত্যেক ধর্মই নিত্য সত্যের আভাস বলিয়া সত্য।

বিশ্বাসই ধর্মের মূল বলায় স্বামীজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'রাজা হইলে আর খাওয়া-পরার কষ্ট থাকে না, কিন্তু রাজা হওয়া যে কঠিন; বিশ্বাস কি কখনও জোর করিয়া হয়? অনুভব না হইলে ঠিক ঠিক বিশ্বাস হওয়া অসম্ভব।' কোন কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে 'সাধু'

বলায় তিনি উত্তর করিলেন, 'আমরা কি সাধু? এমন অনেক সাধু আছেন, যাঁহাদের দর্শন বা স্পর্শমাত্রেই দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়।'

'সন্ন্যাসীরা এরূপ অলস হইয়া কেন কালক্ষেপ করেন? অপরের সাহায্যের উপর কেন নির্ভর করিয়া থাকেন? সমাজের হিতকর কোন কাজকর্ম কেন করেন না?'—প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলিলেন, 'আচ্ছা বল দেখি—তুমি এত কষ্টে অর্থ উপার্জন করিতেছ, তাহার যৎসামান্য অংশ কেবল নিজের জন্য খরচ করিতেছ; বাকী কতক অন্য কতকগুলি লোককে আপনার মনে করে তাহাদের জন্য খরচ করিতেছ। তাহারা সেজন্য না তোমার কৃত উপকার মানে, না যাহা ব্যয় কর তাহাতে সন্তুষ্ট! বাকী—যকের মত প্রাণপণে জমাইতেছ; তুমি মরিয়া গেলে অন্য কেহ তাহা ভোগ করিবে, আর হয়তো আরও টাকা রাখিয়া যাও নাই বলিয়া গালি দিবে। এই তো গেল তোমার হাল। আর আমি ও-সব কিছু করি না। ক্ষুধা পাইলে পেট চাপড়াইয়া, হাত মুখে তুলিয়া দেখাই; যাহা পাই, তাহা খাই; কিছুই কষ্ট করি না, কিছুই সংগ্রহ করি না। আমাদের ভিতর কে বুদ্ধিমান্?—তুমি না আমি?' আমি তো শুনিয়া অবাক। ইহার পূর্বে আমার সম্মুখে এরূপ স্পষ্ট কথা বলিতে তো কাহারও সাহস দেখি নাই।

আহারাদি করিয়া একটু বিশ্রামের পর পুনরায় সেই বন্ধু উকিলটির বাসায় যাওয়া হইল ও তথায় অনেক বাদানুবাদ ও কথোপকথন চলিল। রাত্রি নয়টার সময় স্বামীজীকে লইয়া পুনরায় আমার বাসায় ফিরিলাম। আসিতে আসিতে বলিলাম, 'স্বামীজী, আপনার আজ তর্কবিতর্কে অনেক কষ্ট হইয়াছে।'

তিনি বলিলেন, 'বাবা, তোমরা যেরূপ utilitarian (উপযোগবাদী), যদি আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে তোমরা কি আমাকে এক মুঠা খাইতে দাও? আমি এইরূপ গল্ গল্ করিয়া বকি, লোকের শুনিয়া আমোদ হয়, তাই দলে দলে আসে। কিন্তু জেনো, যে-সকল লোক সভায় তর্কবিতর্ক করে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহারা বাস্তবিক সত্য জানিবার ইচ্ছায় ওরূপ করে না। আমিও বুঝিতে পারি, কে কি ভাবে কি কথা বলে এবং তাহাকে সেইরূপ উত্তর দিই।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা স্বামীজী, সকল প্রশ্নের অমন চোখা চোখা উত্তর আপনার তখনি যোগায় কিরূপে?'

তিনি বলিলেন, 'ঐ-সকল প্রশ্ন তোমাদের পক্ষে নূতন; কিন্তু আমাকে কত লোকে কতবার ঐ প্রশ্নসকল জিজ্ঞাসা করিয়াছে, আর সেগুলির কতবার উত্তর দিয়াছি।'

'রাত্রে আহার করিতে বসিয়া আবার কত কথা কহিলেন। পয়সা না ছুঁইয়া দেশভ্রমণে কত জায়গায় কত কি ঘটনা ঘটিয়াছে, সে-সব বলিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইল—আহা! ইনি কতই কষ্ট, কতই উৎপাত না জানি সহ্য করিয়াছেন! কিন্তু তিনি সে-সব যেন কত মজার কথা, এইরূপ ভাবে হাসিতে হাসিতে সমুদয় বলিতে লাগিলেন। কোথাও তিন দিন উপবাস, কোন স্থানে লঙ্কা খাইয়া এমন পেটজ্বালা যে, এক বাটি তেঁতুল গোলা খাইয়াও থামে না, কোথাও 'এখানে সাধু-সন্ন্যাসী জায়গা পায় না'—এই বলিয়া অপরের তাড়না, বা গুপ্ত পুলিসের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রভৃতি, যাহা শুনিলে আমাদের গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়, সেই-সব ঘটনা তাঁহার পক্ষে যেন তামাসা মাত্র।

রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার বিছানা করিয়া দিয়া আমিও ঘুমাইতে গেলাম, কিন্তু সে রাত্রে আর ঘুম হইল না। ভাবিতে লাগিলাম, এত বৎসরের কঠোর সন্দেহ ও অবিশ্বাস স্বামীজীকে দেখিয়া ও তাঁহার দুই-চার কথা শুনিয়াই সব দূর হইল! আর জিজ্ঞাসা করিবার কিছুই নাই। ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, আমাদের কেন—আমাদের চাকর-বাকরেরও তাঁহার প্রতি এত ভক্তি-শ্রদ্ধা হইল যে, তাহাদের সেবায় ও আগ্রহে স্বামীজীকে সময়ে সময়ে বিরক্ত হইতে হইত।

২০ অক্টোবর। সকালে উঠিয়া স্বামীজীকে নমস্কার করিলাম। এখন সাহস বাড়িয়াছে, ভক্তিও হইয়াছে। স্বামীজীও অনেক বন, নদী, অরণ্যের বিবরণ আমার নিকট শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই শহরে আজ তাঁহার চার দিন বাস হইল। পঞ্চম দিনে তিনি বলিলেন, 'সন্ন্যাসীদের—নগরে তিন দিনের বেশী ও গ্রামে এক দিনের বেশী থাকিতে নাই। আমি শীঘ্র যাইতে ইচ্ছা করিতেছি। কিন্তু আমি ও-কথা কোনমতেই শুনিব না, উহা তর্ক করিয়া

বুঝাইয়া দেওয়া চাই।' পরে অনেক বাদানুবাদের পর বলিলেন, 'এক স্থানে অধিক দিন থাকিলে মায়া মমতা বাড়িয়া যায়। আমরা গৃহ ও আত্মীয় বন্ধু ত্যাগ করিয়াছি, সেইরূপ মায়ায় মুগ্ধ হইবার যত উপায় আছে, তাহা হইতে দূরে থাকাই আমাদের পক্ষে ভাল।'

আমি বলিলাম, 'আপনি কখনও মুগ্ধ হইবার নন।' পরিশেষে আমার অতিশয় আগ্রহ দেখিয়া আরও দুই-চার দিন থাকিতে স্বীকার করিলেন। ইতোমধ্যে আমার মনে হইল, স্বামীজী যদি সাধারণের জন্য বক্তৃতা দেন, তাহা হইলে আমরাও তাঁহার লেকচার শুনি এবং অপর কত লোকেরও কল্যাণ হয়। অনেক অনুরোধ করিলাম, কিন্তু লেকচার দিলে হয়তো নামযশের ইচ্ছা হইবে, এই বলিয়া তিনি কোনমতে উহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তবে সভায় প্রশ্নের উত্তর দান (conversational meeting) করিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই—এ কথা জানাইলেন।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী Pickwick Papers১৩ হইতে দুই-তিন পাতা মুখস্থ বলিলেন। আমি উহা অনেকবার পড়িয়াছি, বুঝিলাম—পুস্তকের কোন্ স্থান হইতে তিনি আবৃত্তি করিলেন। শুনিয়া আমার বিশেষ আশ্চর্য বোধ হইল। ভাবিলাম, সন্ন্যাসী হইয়া সামাজিক গ্রন্থ হইতে কি করিয়া এতটা মুখস্থ করিলেন? পূর্বে বোধ হয় অনেকবার ঐ পুস্তক পড়িয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, 'দুইবার পড়িয়াছি—একবার স্কুলে পড়িবার সময় ও আজ পাঁচ-ছয় মাস হইল আর একবার।'

অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তবে কেমন করিয়া স্মরণ রহিল? আমাদের কেন থাকে না?'

স্বামীজী বলিলেন, 'একান্ত মনে পড়া চাই; আর খাদ্যের সারভাগ হইতে প্রস্তুত রেতের অপচয় না করিয়া পুনরায় উহা assimilate করা চাই।'

আর একদিন স্বামীজী মধ্যাহ্নে একাকী বিছানায় শুইয়া একখানি পুস্তক লইয়া পড়িতেছিলেন। আমি অন্য ঘরে ছিলাম। হঠাৎ এরূপ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন যে, আমি এ হাসির বিশেষ কোন কারণ আছে ভাবিয়া তাঁহার ঘরের দরজার নিকট আসিয়া

উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, বিশেষ কিছু হয় নাই। তিনি যেমন বই পড়িতেছিলেন, তেমনি পড়িতেছেন। প্রায় ১৫ মিনিট দাঁড়াইয়া রহিলাম, তথাপি তিনি আমায় দেখিতে পাইলেন না। বই ছাড়া অন্য কোন দিকে তাঁহার মন নাই। পরে আমাকে দেখিয়া ভিতরে আসিতে বলিলেন এবং আমি কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি শুনিয়া বলিলেন, 'যখন যে কাজ করিতে হয়, তখন তাহা একমনে, একপ্রাণে—সমস্ত ক্ষমতার সহিত করিতে হয়। গাজিপুরের পওহারী বাবা ধ্যান-জপ পূজা-পাঠ যেমন একমনে করিতেন, তাঁহার পিতলের ঘটীটি মাজাও ঠিক তেমনি একমনে করিতেন। এমনি মাজিতেন যে, সোনার মত দেখাইত।'

এক সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'স্বামীজী, চুরি করা পাপ কেন? সকল ধর্মে চুরি করিতে নিষেধ করে কেন? আমার মনে হয়, ইহা আমাদের, উহা অপরের—ইত্যাদি মনে করা কেবল কল্পনামাত্র। কই, আমায় না জানাইয়া আমার আত্মীয় বন্ধু কেহ আমার কোন দ্রব্য ব্যবহার করিলে তো উহা চুরি করা হয় না। তার পর পশু-পক্ষী-আদি আমাদের কোন জিনিষ নষ্ট করিলে তাহাকেও তো চুরি বলি না।'

স্বামীজী বলিলেন, 'অবশ্য সর্বাবস্থায় সকল সময় মন্দ এবং পাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, এমন কোন জিনিষ বা কার্য নাই। আবার অবস্থাভেদে প্রত্যেক জিনিষ মন্দ এবং প্রত্যেক কার্যই পাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তবে যাহাতে অপর কাহারও কোন প্রকার কষ্ট উপস্থিত হয় এবং যাহা করিলে শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোন প্রকার দুর্বলতা আসে, সে কর্ম করিবে না; উহাই পাপ, আর তদ্বিপরীত কর্মই পুণ্য। মনে কর, তোমার কোন জিনিষ কেহ চুরি করিলে তোমার দুঃখ হয় কিনা? তোমার যেমন, সমস্ত জগতেরও তেমনি জানিবে। এই দুই-দিনের জগতে সামান্য কিছুর জন্য যদি তুমি এক প্রাণীকে দুঃখ দিতে পার, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে ভবিষ্যতে তুমি কি মন্দ কর্ম না করিতে পারিবে? আবার পাপ-পুণ্য না থাকিলে সমাজ চলে না। সমাজে থাকিতে হইলে তাহার নিয়মাদি পালন করা চাই। বনে গিয়া উলঙ্গ হইয়া নাচো ক্ষতি নাই—কেহ তোমাকে কিছু

বলিবে না; কিন্তু শহরে ঐরূপ করিলে পুলিসের দ্বারা ধরাইয়া তোমায় কোন নির্জন স্থানে বন্ধ করিয়া রাখাই উচিত।'

স্বামীজী অনেক সময় ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভিতর দিয়া বিশেষ শিক্ষা দিতেন। তিনি গুরু হইলেও তাঁহার কাছে বসিয়া থাকা মাষ্টারের কাছে বসার মত ছিল না। খুব রঙ্গরস চলিতেছে; বালকের মত হাসিতে হাসিতে ঠাট্টার ছলে কত কথাই কহিতেছেন, সকলকে হাসাইতেছেন; আবার তখনই এমনি গম্ভীরভাবে জটিল প্রশ্নসমূহের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেন যে, উপস্থিত সকলে অবাক হইয়া ভাবিত—ইঁহার ভিতর এত শক্তি! এই তো দেখিতেছিলাম, আমাদের মতই একজন! সকল সময়েই তাঁহার নিকট লোকে শিক্ষা লইতে আসিত। সকল সময়েই তাঁহার দ্বার অবারিত ছিল। নানা লোকে নানা ভাবেও আসিতঃ কেহ বা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে, কেহ বা খোশগল্প শুনিতে, কেহ বা তাঁহার নিকট আসিলে অনেক ধনী বড়লোকের সহিত আলাপ করিতে পারিবে বলিয়া, আবার কেহ বা সংসার-তাপে জর্জরিত হইয়া তাঁহার নিকট দুই দণ্ড জুড়াইবে এবং জ্ঞান ও ধর্ম লাভ করিবে বলিয়া। কিন্তু তাঁহার এমনি আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল, যে যে-ভাবেই আসুক না কেন, তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিতেন এবং তাঁহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মর্মভেদী দৃষ্টির হাত হইতে কাহারও এড়াইবার বা কিছু গোপন করিবার সাধ্য ছিল না। এক সময়ে কোন সম্ভ্রান্ত ধনীর একমাত্র সন্তান ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা এড়াইবে বলিয়া স্বামীজীর নিকট ঘন ঘন আসিতে লাগিল এবং সাধু হইবে, এই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। সে আবার আমার এক বন্ধুর পুত্র। আমি স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ঐ ছেলেটি আপনার কাছে কি মতলবে এত বেশী বেশী আসে? উহাকে কি সন্ন্যাসী হইতে উপদেশ দিবেন? উহার বাপ আমার একজন বন্ধু।'

স্বামীজী বলিলেন, 'উহার পরীক্ষা কাছে, পরীক্ষা দিবার ভয়ে সাধু হইবার ইচ্ছা। আমি উহাকে বলিয়াছি, এম.এ. পাশ করিয়া সাধু হইতে আসিও; বরং এম.এ পাশ করা সহজ, কিন্তু সাধু হওয়া তদপেক্ষা কঠিন।'

স্বামীজী আমার বাসায় যতদিন ছিলেন, প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার কথোপকথন শুনিতে যেন সভা বসিয়া যাইত, এতই অধিক লোকসমাগম হইত। ঐ সময় এক দিন আমার বাসায় একটি চন্দনগাছের তলায় তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, জন্মেও তাহা ভুলিতে পারিব না। সে প্রসঙ্গের উত্থাপনে অনেক কথা বলিতে হইবে।

কিছু পূর্ব হইতে আমার স্ত্রীর ইচ্ছা হয়, গুরুর নিকট মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করে। আমার তাহাতে আপত্তি ছিল না। তবে আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, 'এমন লোককে গুরু করিও, যাঁহাকে আমিও ভক্তি করিতে পারি। গুরু বাড়ী ঢুকিলেই যদি আমার ভাবান্তর হয়, তাহা হইলে তোমার কিছুই আনন্দ বা উপকার হইবে না। কোন সৎপুরুষকে যদি গুরুরূপে পাই, তাহা হইলে উভয়ে মন্ত্র লইব, নতুবা নহে।' সেও তাহা স্বীকার করে। স্বামীজীর আগমনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এই সন্ন্যাসী যদি তোমার গুরু হন, তাহা হইলে তুমি শিষ্যা হইতে ইচ্ছা কর কি?' সেও সাগ্রহে বলিল, 'উনি কি গুরু হইবেন? হইলে তো আমরা কৃতার্থ হই।'

স্বামীজীকে একদিন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'স্বামীজী, আমার একটি প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন?' স্বামীজী প্রার্থনা জানাইবার আদেশ করিলে আমাদের উভয়কে দীক্ষা দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন, 'গৃহস্থের পক্ষে গৃহস্থ গুরুই ভাল।' গুরু হওয়া বড় কঠিন, শিষ্যের সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে হয়, দীক্ষার পূর্বে গুরুর সহিত শিষ্যের অন্ততঃ তিনবার সাক্ষাৎ হওয়া আবশ্যক—প্রভৃতি নানা কথা কহিয়া আমায় নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। যখন দেখিলেন, আমি কোনপ্রকারে ছাড়িবার পাত্র নহি, তখন অগত্যা স্বীকার করিলেন এবং ২৫ অক্টোবর, ১৮৯২ আমাদের দীক্ষাপ্রদান করিলেন। এখন আমার ভারি ইচ্ছা হইল, স্বামীজীর ফটো তুলিয়া লই। তিনি সহজে স্বীকৃত হইলেন না। পরে অনেক বাদানুবাদের পর আমার অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া ২৮ তারিখে ফটো তোলাইতে সম্মত হইলেন এবং ফটো লওয়া হইল। ইতঃপূর্বে তিনি এক ব্যক্তির আগ্রহসত্ত্বেও ফটো

তুলিতে দেন নাই বলিয়া দুই কপি ফটো তাহাকে পাঠাইয়া দিবার কথা আমাকে বলিলেন। আমিও সে কথা সানন্দে স্বীকার করিলাম।

একদিন স্বামীজী বলিলেন, 'তোমার সহিত জঙ্গলে তাঁবু খাটাইয়া আমার কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা। কিন্তু চিকাগোয় ধর্মসভা হইবে, যদি তাহাতে যাইবার সুবিধা হয় তো সেখানে যাইব।' আমি চাঁদার লিষ্ট করিয়া টাকা-সংগ্রহের প্রস্তাব করায় তিনি কি ভাবিয়া স্বীকার করিলেন না। এই সময় স্বামীজীর ব্রতই ছিল, টাকাকড়ি স্পর্শ বা গ্রহণ করিবেন না। আমি অনেক অনুরোধ করিয়া তাঁহার মারহাট্টি জুতার পরিবর্তে একজোড়া জুতা ও একগাছি বেতের ছড়ি দিয়াছিলাম। ইতঃপূর্বে কোলাপুরের রাণী অনেক অনুরোধ করিয়াও স্বামীজীকে কিছুই গ্রহণ করাইতে না পারিয়া অবশেসে দুইখানি গেরুয়া বস্ত্র পাঠাইয়া দেন। স্বামীজীও গেরুয়া দুইখানি গ্রহণ করিয়া যে বস্ত্রগুলি পরিধান করিয়াছিলেন, সেগুলি সেইখানেই ত্যাগ করেন এবং বলেন, সন্ন্যাসীর বোঝা যত কম হয় ততই ভাল।

ইতঃপূর্বে আমি ভগবদ্‌গীতা অনেক বার পড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু বুঝিতে না পারায় পরিশেষে উহাতে বুঝিবার বড় কিছু নাই মনে করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। স্বামীজী গীতা লইয়া আমাদিগকে একদিন বুঝাইতে লাগিলেন। তখন দেখিলাম, উহা কি অদ্ভুত গ্রন্থ! গীতার মর্ম গ্রহণ করিতে তাঁহার নিকটে যেমন শিখিয়াছিলাম, তেমনি আবার অন্যদিকে জুল ভার্ন (Jules Verna)-এর Scientific Novels এবং কার্লাইল (Carlyle)-এর Sartor Resartus তাঁহার নিকটেই পড়িতে শিখি।

তখন স্বাস্থ্যের জন্য ঔষধাদি অনেক ব্যবহার করিতাম। সে কথা জানিতে পারিয়া একদিন তিনি বলিলেন, 'যখন দেখিবে কোন রোগ এত প্রবল হইয়াছে যে, শয্যাশায়ী করিয়াছে আর উঠিবার শক্তি নাই, তখনই ঔষধ খাইবে, নতুবা নহে। Nervous debility (স্নায়ুবিক দুর্বলতা) প্রভৃতি রোগের শতকরা ৯০টা কাল্পনিক। ঐ-সকল রোগের হাত হইতে ডাক্তারেরা যত লোককে বাঁচান, তার চাইতে বেশী লোককে মারেন। আর ওরূপ সর্বদা 'রোগ রোগ' করিয়াই বা কি হইবে? যত দিন বাঁচ আনন্দে কাটাও। তবে যে আনন্দে একবার সন্তাপ আসিয়াছে, তাহা আর করিও না। তোমার আমার মত একটা মরিলে

পৃথিবীও আপনার কেন্দ্র হইতে দূরে যাইবে না, বা জগতের কোন বিষয়ের কিছু ব্যাঘাত হইবে না।'

এই সময়ে আবার অনেক কারণবশতঃ উপরিস্থ কর্মচারী সাহেবদের সহিত আমার বড় একটা বনিত না। তাঁহারা সামান্য কিছু বলিলে আমার মাথা গরম হইয়া উঠিত এবং এমন ভাল চাকরি পাইয়াও একদিনের জন্য সুখী হই নাই। তাঁহাকে এ-সমস্ত কথা বলায় তিনি বলিলেন, 'কিসের জন্য চাকরি করিতেছ? বেতনের জন্য তো? বেতন তো মাসে মাসে ঠিক পাইতেছ, তবে কেন মনে কষ্ট পাও? আর ইচ্ছা হইলে যখন চাকরি ছাড়িয়া দিতে পার, কেহ বাঁধিয়া রাখে নাই, তখন বিষম বন্ধনে পড়িয়াছি ভাবিয়া দুঃখের সংসারে আরও দুঃখ বাড়াও কেন? আর এক কথা, বল দেখি—যাহার জন্য বেতন পাইতেছ, অফিসের সেই কাজগুলি করিয়া দেওয়া ছাড়া তোমার উপরওয়ালা সাহেবদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য কখনও কিছু করিয়াছ কি? কখনও সেজন্য চেষ্টা কর নাই, অথচ তাহারা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট নহে বলিয়া তাহাদের উপর বিরক্ত! ইহা কি বুদ্ধিমানের কাজ? জানিও, আমরা অন্যের উপর হৃদয়ের যে ভাব রাখি, তাহাই কাজে প্রকাশ পায়; আর প্রকাশ না করিলেও তাহাদের ভিতরে আমাদের উপর ঠিক সেই ভাবের উদয় হয়। আমাদের ভিতরকার ছবিই জগতে প্রকাশিত রহিয়াছে—আমরা দেখি। আপ্ ভালা তো জগৎ ভালা—এ কথা যে কতদূর সত্য কেহই জানে না। আজ হইতে মন্দটি দেখা একেবারে ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা কর। দেখিবে, যে পরিমাণে তুমি উহা করিতে পারিবে, সেই পরিমাণে তাহাদের ভিতরের ভাব এবং কার্যও পরিবর্তিত হইয়াছে।' বলা বাহুল্য, সেই দিন হইতে আমার ঔষধ খাইবার বাতিক দূর হইল এবং অপরের উপর দোষদৃষ্টি ত্যাগ করিতে চেষ্টা করায় ক্রমে জীবনের একটা নূতন পৃষ্ঠা খুলিয়া গেল।

একবার স্বামীজীর নিকট ভালই বা কি এবং মন্দই বা কি—এই বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থিত করায় তিনি বলিলেন, 'যাহা অভীষ্ট কার্যের সাধনভূত তাহাই ভাল; আর যাহা তাহার প্রতিরোধক তাহাই মন্দ। ভাল-মন্দের বিচার আমরা জায়গা উঁচু-নীচু-বিচারের ন্যায় করিয়া থাকি। যত উপরে উঠিবে তত দুই-ই এক হইয়া যাইবে। চন্দ্রে পাহাড় ও সমতল আছে—বলে,

কিন্তু আমরা সব এক দেখি, সেইরূপ।' স্বামীজীর এই এক অসাধারণ শক্তি ছিল—যে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করুক না কেন, তাহার উপযুক্ত উত্তর তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভিতর হইতে এমন যোগাইত যে, মনের সন্দেহ একেবারে দূর হইয়া যাইত।

আর একদিনের কথা—কলিকাতায় একটি লোক অনাহারে মারা গিয়াছে, খবরের কাগজে এই কথা পড়িয়া স্বামীজী এত দুঃখিত হইয়াছিলেন যে, তাহা বলিবার নহে। বার বার বলিতে লাগিলেন, এইবার বা দেশটা উৎসন্ন যায়! কেন—জিজ্ঞাসা করায় বলিলেনঃ দেখিতেছ না, অন্যান্য দেশে কত poor-house, work-house, charity fund প্রভৃতি সত্ত্বেও শত শত লোক প্রতিবৎসর অনাহারে মরে, খবরের কাগজে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে কিন্তু এক মুষ্টিভিক্ষার পদ্ধতি থাকায় অনাহারে লোক মরিতে কখনও শোনা যায় নাই। আমি এই প্রথম কাগজে এ কথা পড়িলাম যে, দুর্ভিক্ষ ভিন্ন অন্য সময়ে কলিকাতায় অনাহারে লোক মরে।

ইংরেজী শিক্ষার কৃপায় আমি দুই-চারি পয়সা ভিক্ষুককে দান করাটা অপব্যয় মনে করিতাম। মনে হইত, ঐরূপে যৎসামান্য যাহা কিছু দান করা যায়, তাহাতে তাহাদের কোন উপকার তো হয়ই না, বরং বিনা পরিশ্রমে পয়সা পাইয়া, তাহা মদ-গাঁজায় খরচ করিয়া তাহারা আরও অধঃপাতে যায়। লাভের মধ্যে দাতার কিছু মিছে খরচ বাড়িয়া যায়। সেজন্য আমার মনে হইত, লোককে কিছু কিছু দেওয়া অপেক্ষা একজনকে বেশী দেওয়া ভাল। স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেনঃ ভিখারী আসিলে যদি শক্তি থাকে তো যাহা হয় কিছু দেওয়া ভাল। দেবে তো দু-একটি পয়সা; সেজন্য সে কিসে খরচ করিবে, সদ্ব্যয় হইবে কি অপব্যয় হইবে, এ-সব লইয়া এত মাথা ঘামাইবার দরকার কি? আর সত্যই যদি সেই পয়সা গাঁজা খাইয়া উড়ায়, তাহা হইলেও তাহাকে দেওয়ায় সমাজের লাভ বৈ লোকসান নাই। কেন না, তোমার মত লোকেরা দয়া করিয়া কিছু কিছু না দিলে সে উহা তোমাদের নিকট হইতে চুরি করিয়া লইবে। তাহা অপেক্ষা দুই পয়সা ভিক্ষা করিয়া গাঁজা টানিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তাহা কি তোমাদেরই ভাল নহে? অতএব ঐ-প্রকার দানেও সমাজের উপকার বৈ অপকার নাই।

প্রথম হইতেই স্বামীজীকে বাল্যবিবাহের উপর ভারি চটা দেখিয়াছি। সর্বদাই সকল লোককে বিশেষতঃ বালকদের সাহস বাঁধিয়া সমাজের এই কলঙ্কের বিপক্ষে দাঁড়াইতে এবং উদ্যোগী হইতে উপদেশ দিতেন। স্বদেশের প্রতি এরূপ অনুরাগও কোন মানুষের দেখি নাই। পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফিরিবার পর স্বামীজীকে যাঁহারা প্রথম দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন না—সেখানে যাইবার পূর্বে তিনি সন্ন্যাস-আশ্রমের কঠোর নিয়মাদি পালন করিয়া, কাঞ্চনমাত্র স্পর্শ না করিয়া কতকাল ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার মত শক্তিমান্ পুরুষের এত বাঁধাবাঁধি নিয়মাদির আবশ্যক নাই—কোন লোক একবার এই কথা বলায় তিনি বলেনঃ দেখ, মন বেটা বড় পাগল—ঘোর মাতাল, চুপ করে কখনই থাকে না, একটু সময় পেলেই আপনার পথে টেনে নিয়ে যাবে। সেইজন্য সকলেরই বাঁধাবাঁধি নিয়মের ভিতরে থাকা আবশ্যক। সন্ন্যাসীরও সেই মনের উপর দখল রাখিবার জন্য নিয়মে চলিতে হয়। সকলেই মনে করেন, মনের উপর তাঁহাদের খুব দখল আছে। তবে ইচ্ছা করিয়া কখনও একটু আলগা দেন মাত্র। কিন্তু কাহার কতটা দখল হইয়াছে, তাহা একবার ধ্যান করিতে বসিলেই টের পাওয়া যায়। এক বিষয়ের উপর চিন্তা করিব মনে করিয়া বসিলে দশ মিনিটও ঐ বিষয়ে একক্রমে মন স্থির রাখা যায় না। প্রত্যেকেই মনে করেন, তিনি স্ত্রৈণ নন, তবে আদর করিয়া স্ত্রীকে আধিপত্য করিতে দেন মাত্র। মনকে বশে রাখিয়াছি—মনে করাটা ঠিক ঐ রকম। মনকে বিশ্বাস করিয়া কখনও নিশ্চিন্ত থাকিও না।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিলাম—স্বামীজী, দেখিতেছি ধর্ম ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে অনেক লেখাপড়া জানা আবশ্যক।

তিনি বলিলেনঃ নিজে ধর্ম বুঝিবার জন্য লেখাপড়ার আবশ্যক নাই। কিন্তু অন্যকে বুঝাইতে হইলে উহার বিশেষ আবশ্যক। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ‘রামকেষ্ট’ বলিয়া সহি করিতেন, কিন্তু ধর্মের সারতত্ত্ব তাঁহা অপেক্ষা কে বুঝিয়াছিল?

আমার বিশ্বাস ছিল, সাধু-সন্ন্যাসীর স্থূলকায় ও সদা সন্তুষ্টচিত্ত হওয়া অসম্ভব। একদিন হাসিতে হাসিতে তাঁহার দিকে কটাক্ষ করিয়া ঐ কথা বলায় তিনিও বিদ্রূপচ্ছলে উত্তর

করিলেনঃ ইহাই আমার Famine Insurance Fund—যদি পাঁচ-সাত দিন খাইতে না পাই, তবু আমার চর্বি আমাকে জীবিত রাখিবে। তোমরা একদিন না খাইলেই সব অন্ধকার দেখিবে। আর যে ধর্ম মানুষকে সুখী করে না, তাহা বাস্তবিক ধর্ম নহে, dyspepsia (অজীর্ণতা)-প্রসূত রোগবিশেষ বলিয়া জানিও।

স্বামীজী সঙ্গীত-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। একদিন একটি গান আরম্ভও করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি 'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস'; তারপর শুনিবার আমার অবসরই বা কোথায়? তাঁহার কথা ও গল্পই আমাদিগকে মোহিত করিয়াছিল।

আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই, যথা—Chemistry, Physics, Geology, Astronomy, Mixed Mathematics প্রভৃতিতে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রশ্নই অতি সরল ভাষায় দুই-চারি কথায় বুঝাইয়া দিতেন। আবার ধর্মবিষয়ক মীমাংসাও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে ও দৃষ্টান্তে বিশদভাবে বুঝাইতে এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের যে একই লক্ষ্য—একই দিকে গতি, তাহা দেখাইতে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতা আর কাহারও দেখি নাই।

লঙ্কা, মরিচ প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। কারণ জিজ্ঞাসায় একদিন বলিয়াছিলেনঃ পর্যটনকালে সন্ন্যাসীদের দেশ-বিদেশের নানাপ্রকার দূষিত জল পান করিতে হয়; তাহাতে শরীর খারাপ করে। এই দোষ-নিবারণের জন্য তাহাদের মধ্যে অনেকেই গাঁজা, চরস প্রভৃতি নেশা করিয়া থাকে। আমিও সেইজন্য এত লঙ্কা খাই।

রাজোয়ারা ও খেতড়ির রাজা, কোলাপুরের ছত্রপতি ও দাক্ষিণাত্যের অনেক রাজা-রাজড়া তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন; তাঁহাদেরও তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। অসামান্য ত্যাগী হইয়া রাজা-রাজড়ার সহিত অত মেশামিশি তিনি কেন করেন, এ-কথা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইত না। কোন কোন নির্বোধ লোক এ-জন্য তাঁহাকে কটাক্ষ করিতেও ছাড়িত না।

কারণ জিজ্ঞাসায় একদিন বলিলেনঃ হাজার হাজার দরিদ্র লোককে উপদেশ দিয়া সৎকার্য করাইতে পারিলে যে ফল হইবে, একজন শ্রীমান্ রাজাকে সেইদিকে আনিতে পারিলে তদপেক্ষা কত অধিক ফল হইবে, ভাব দেখি! গরীব প্রজার ইচ্ছা হইলেও সৎকার্য করিবার ক্ষমতা কোথায়? কিন্তু রাজার হাতে সহস্র সহস্র প্রজার মঙ্গলবিধানের ক্ষমতা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে, কেবল উহা করিবার ইচ্ছা নাই। সেই ইচ্ছা যদি কোনরূপে তাহার ভিতর একবার জাগাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অধীন সকল প্রজার অবস্থা ফিরিয়া যাইবে এবং জগতের কত বেশী কল্যাণ হইবে।

বাগবিতণ্ডায় ধর্ম নাই, ধর্ম অনুভব-প্রত্যক্ষের বিষয়, এই কথাটি বুঝাইবার জন্য তিনি কথায় কথায় বলিতেনঃ Test of pudding lies in eating, অনুভব কর; তাহা না হইলে কিছুই বুঝিবে না। তিনি কপট সন্ন্যাসীদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। বলিতেন, ঘরে থাকিয়া মনের উপর অধিকার স্থাপন করিয়া তবে বাহিরে যাওয়া ভাল; নতুবা নবানুরাগটুকু কমিবার পর প্রায় গাঁজাখোর সন্ন্যাসীদের দলে মিশিয়া পড়িতে হয়।

আমি বলিলাম, কিন্তু ঘরে থাকিয়া সেটি হওয়া যে অত্যন্ত কঠিন; সর্বভূতকে সমান চোখে দেখা, রাগ-দ্বেষ ত্যাগ করা প্রভৃতি যে-সকল কাজ ধর্মলাভের প্রধান সহায়—আপনি যাহা বলেন, তাহা যদি আমি আজ হইতে অনুষ্ঠান করিতে থাকি, তবে কাল হইতে আমার চাকর ও অধীন কর্মচারিগণ এবং দেশের লোকেও আমাকে এক দণ্ড শান্তিতে থাকিতে দিবে না।

উত্তরে তিনি পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্প ও সন্ন্যাসীর গল্পটি বলিয়া বলিলেনঃ কখনও ফোঁস ছেড়ো না, আর কর্তব্য পালন করিতেছ মনে করিয়া সকল কর্ম করিও। কেহ দোষ করে, দণ্ড দিবে; কিন্তু দণ্ড দিতে গিয়া কখনও রাগ করিও না। পরে পূর্বের প্রসঙ্গ পুনরায় উঠাইয়া বলিলেনঃ

এক সময়ে আমি এক তীর্থস্থানের পুলিস ইনস্পেক্টরের অতিথি হইয়াছিলাম; লোকটির বেশ ধর্মজ্ঞান ও ভক্তি ছিল। তাঁহার বেতন ১২৫ টাকা, কিন্তু দেখিলাম, তাঁহার বাসায়

খরচ মাসে দুই-তিন শত টাকা হইবে। যখন বেশী জানাশুনা হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার তো আয় অপেক্ষা খরচ বেশী দেখিতেছি—চলে কিরূপে?' তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'আপনারাই চালান। এই তীর্থস্থলে যে-সকল সাধু-সন্ন্যাসী আসেন, তাঁহাদের ভিতরে সকলেই কিছু আপনার মত নন। সন্দেহ হইলে তাঁহাদের নিকট কি আছে না আছে, তল্লাস করিয়া থাকি। অনেকের নিকট প্রচুর টাকা-কড়ি বাহির হয়। যাহাদিগকে চোর সন্দেহ করি, তাহারা টাকাকড়ি ফেলিয়া পালায়, আর আমি সেই সমস্ত আত্মসাৎ করি। অপর ঘুষঘাস কিছু লই না।'

স্বামীজীর সহিত একদিন 'অনন্ত' (Infinity) সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়। সেই কথাটি বড়ই সুন্দর ও সত্য;' তিনি বলিলেন, 'There can be no two infinities.' আমি সময় অনন্ত (time is infinite) ও আকাশ অনন্ত (space is infinite) বলায় তিনি বলেনঃ আকাশ অনন্তটা বুঝিলাম, কিন্তু সময় অনন্তটা বুঝিলাম না। যাহা হউক, একটা পদার্থ অনন্ত—এ কথা বুঝি, কিন্তু দুইটা জিনিষ অনন্ত হইলে কোন্‌টা কোথায় থাকে? আর একটু এগোও, দেখিবে—সময়ও যাহা, আকাশও তাহাই; আরও অগ্রসর হইয়া বুঝিবে, সকল পদার্থই অনন্ত, এবং সে-সকল অনন্ত পদার্থ একটা বৈ দুইটা দশটা নয়।

এইরূপে স্বামীজীর পদার্পণে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত আমার বাসায় আনন্দের স্রোত বহিয়াছিল। ২৭ তারিখে বলিলেন, 'আর থাকিব না; রামেশ্বর যাইব মনে করিয়া অনেক দিন হইল এই দিকে চলিতেছি। যদি এই ভাবে অগ্রসর হই, তাহা হইলে এ জনমে আর রামেশ্বর পৌঁছান হইবে না।' আমি অনেক অনুরোধ করিয়াও আর রাখিতে পারিলাম না। ২৭ অক্টোবর মেল ট্রেনে, তিনি মর্মাগোয়া যাত্রা করিবেন, স্থির হইল। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কত লোককে মোহিত করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। টিকিট কিনিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে বসাইয়া আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম ও বলিলাম, 'স্বামীজী, জীবনে আজ পর্যন্ত কাহাকেও আন্তরিক ভক্তির সহিত প্রণাম করি নাই, আজ আপনাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইলাম।'

* * *

স্বামীজীর সহিত আমার তিনবার মাত্র দেখা হয়। প্রথম—আমেরিকা যাইবার পূর্বে; সে-বারকার দেখার কথা অনেকটা বলিলাম। দ্বিতীয়—যখন তিনি দ্বিতীয়বার বিলাত এবং আমেরিকা যাত্রা করেন তাহার কিছু পূর্বে। তৃতীয় এবং শেষবার দেখা হয় তাঁহার দেহত্যাগের ছয়-সাত মাস পূর্বে। এই কয়বারে তাঁহার নিকট যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহার আদ্যোপান্ত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। যাহা মনে আছে, তাহার ভিতর সাধারণ-পাঠকের উপযোগী বিষয়গুলি জানাইতে চেষ্টা করিব।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি হিন্দুদিগের জাতি-বিচার সম্বন্ধে ও কোন কোন সম্প্রদায়ের ব্যবহারের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়া যে বক্তৃতাগুলি মান্দ্রাজে দিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম, স্বামীজীর ভাষাটা একটু বেশী কড়া হইয়াছে। তাঁহার নিকট সে কথা প্রকাশও করিয়াছিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেনঃ যাহা কিছু বলিয়াছি, সমস্ত সত্য। আর যাহাদের সম্বন্ধে ঐরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছি, তাঁহাদের কার্যের তুলনায় উহা বিন্দুমাত্রও অধিক কড়া নহে। সত্য কথার সঙ্কোচ বা গোপন করার তো কোন কারণ দেখি না; তবে ঐরূপ কার্যের ঐরূপ সমালোচনা করিয়াছি বলিয়া মনে করিও না যে, তাঁহাদের উপর আমার রাগ ছিল বা আছে, অথবা কেহ কেহ যেমন ভাবিয়া থাকেন, কর্তব্যবোধে যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য এখন আমি দুঃখিত। ও-কথার একটাও সত্য নহে। আমি রাগিয়াও ঐ কাজ করি নাই এবং করিয়াছি বলিয়াও দুঃখিত নহি। এখনও যদি ঐরূপ কোন অপ্রিয় কার্য করা কর্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এখনও ঐরূপ নিঃসঙ্কোচে উহা নিশ্চয় করিব।

ভণ্ড সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে আর একদিন কথা উঠায় বলিলেনঃ অবশ্য অনেক বদমায়েস লোক ওয়ারেণ্টের ভয়ে কিম্বা উৎকট দুষ্কর্ম করিয়া লুকাইবার জন্য সন্ন্যাসীর বেশে বেড়ায় সত্য; কিন্তু তোমাদেরও একটু দোষ আছে। তোমরা মনে কর, কেহ সন্ন্যাসী হইলেই তাহার ঈশ্বরের মত ত্রিগুণাতীত হওয়া চাই। সে পেট ভরিয়া ভাল খাইলে দোষ, বিছানায় শুইলে দোষ, এমন কি, জুতা বা ছাতি পর্যন্ত তাহার ব্যবহার করার যো নাই। কেন, তাহারাও তো মানুষ, তোমাদের মতে পূর্ণ পরমহংস না হইলে তাহার আর গেরুয়া বস্ত্র

পরিবার অধিকার নাই—ইহা ভুল। এক সময়ে আমার একটি সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ হয়। তাঁহার ভাল পোষাকের উপর ভারি ঝোঁক। তোমরা তাঁহাকে দেখিলে নিশ্চয়ই ঘোর বিলাসী মনে করিবে। কিন্তু বাস্তবিক তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী।

স্বামীজী বলিতেনঃ দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে মানসিক ভাব ও অনুভবের অনেক তারতম্য হয়। ধর্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। প্রত্যেক মানুষেরই আবার একটা-না-একটা বিষয়ে বেশী ঝোঁক দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের প্রত্যেকেই নিজেকে বেশী বুদ্ধিমান্ মনে করে। তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমিই কেবল বুঝি, অন্যে বুঝে না, ইহাতেই যত গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। প্রত্যেকেই চায়, প্রত্যেক বিষয়টা অপর সকলে তাহারই মত দেখুক ও বুঝুক। সে যেটা সত্য বুঝিয়াছে বা যাহা জানিয়াছে তাহা ছাড়া আর কোন সত্য থাকিতে পারে না। সাংসারিক বিষয়েই হউক বা ধর্মসম্বন্ধীয় কোন বিষয়েই হউক, ও-রূপ ভাব কোনমতে মনে আসিতে দেওয়া উচিত নয়।

জগতের কোন বিষয়েই সকলের উপর এক আইন খাটে না। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে নীতি এবং সৌন্দর্যবোধও বিভিন্ন দেখা যায়। তিব্বত-দেশে এক স্ত্রীলোকের বহু পতি থাকার প্রথা প্রচলিত আছে। হিমালয়-ভ্রমণকালে আমার ঐরূপ একটি তিব্বতীয় পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ঐ পরিবারে ছয়জন পুরুষ এবং ঐ ছয়জনের একটি স্ত্রী ছিল। ক্রমে পরিচয়ের গাঢ়তা জন্মিলে আমি একদিন তাহাদের ঐ কুপ্রথা সম্বন্ধে বলায় তাহারা বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল, 'তুমি সাধু সন্ন্যাসী হইয়া লোককে স্বার্থপরতা শিখাইতে চাহিতেছ? এটি আমারই উপভোগ্য, অন্যের নয়—এরূপ ভাবা কি অন্যায় নহে?' আমি তো শুনিয়া অবাক!

নাসিকা এবং পায়ের খর্বতা লইয়াই চীনের সৌন্দর্য-বিচার, এ-কথা সকলেরই জানা আছে। আহারাদি সম্বন্ধেও ঐরূপ। ইংরেজ আমাদের মত সুবাসিত চাউলের অন্ন ভালবাসে না। এক সময়ে কোন স্থানের জজ-সাহেবের অন্যত্র বদলী হওয়ায় তথাকার কতকগুলি উকিল মোক্তার তাঁহার সম্মানার্থ উত্তম সিধা পাঠাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কয়েক সের সুবাসিত চাউল ছিল। জজ-সাহেব সুবাসিত চাউলের ভাত খাইয়া উহা পচা চাউল মনে

করেন এবং উকিলদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলেন, ‘ You ought not to have given me rotten rice.’—(তোমাদের পচা চালগুলি আমাকে দেওয়া ভাল হয় নাই।)

কোন এক সময়ে ট্রেনে যাইতেছিলাম; সেই কামরায় চার-পাঁচটি সাহেব ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তামাকের বিষয়ে আমি বলিলাম, ‘সুবাসিত গুড়ুক তামাক জলপূর্ণ হুঁকায় ব্যবহার করাই তামাকু-সেবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ।’ আমার নিকট খুব ভাল তামাক ছিল, তাঁহাদিগকে উহা দেখিতেও দিলাম। তাঁহারা আঘ্রাণ লইয়াই বললেন, ‘এ তো অতি দুর্গন্ধ! ইহাকে তুমি সুগন্ধ বল?’ এইরূপে গন্ধ, আস্বাদ, সৌন্দর্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই সমাজ-দেশ-কালভেদে ভিন্ন ভিন্ন মত।

স্বামীজীর পূর্বোক্ত কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে আমার বিলম্ব হয় নাই। আমার মনে হইল, পূর্বে শিকার করা আমার কত প্রিয় ছিল। কোন পশুপক্ষী দেখিলে কতক্ষণে উহাকে মারিব, এই জন্য প্রাণ ছটফট করিত। মারিতে না পারিলে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইত। এখন ও-রূপ প্রাণিবধ একেবারেই ভাল লাগে না। সুতরাং কোন জিনিষটা ভাল লাগা বা মন্দ লাগা কেবল অভ্যাসের কাজ।

আপনার মত বজায় রাখিতে প্রত্যেক মানুষেরই একটা বিশেষ জিদ দেখা যায়। ধর্মমত সম্বন্ধে আবার উহার বিশেষ প্রকাশ। স্বামীজী ঐ সম্বন্ধে একটি গল্প বলিতেনঃ এক সময়ে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করিবার জন্য অন্য এক রাজা সদলবলে উপস্থিত হইলেন। কাজেই শত্রুর হাত হইতে কিরূপে রক্ষা পাওয়া যায় স্থির করিবার জন্য সেই রাজ্যে এক মহাসভা আহূত হইল। সভায় ইঞ্জিনীয়র, সূত্রধর, চর্মকার, উকিল, পুরোহিত প্রভৃতি সভাসদ্‌গণ উপস্থিত হইলেন। ইঞ্জিনীয়র বলিলেন, ‘শহরের চারিদিকে বেড় দিয়া এক বৃহৎ খাল খনন কর।’ সূত্রধর বলিল, ‘কাঠের দেওয়াল দেওয়া যাক।’ চামার বলিল, ‘চামরার মত মজবুত কিছুই নাই, চামরার বেড়া দাও।’ কামার বলিল, ‘ও-সব কাজের কথা নয়, লোহার দেওয়ালই ভাল, ভেদ করিয়া গুলিগোলা আসিতে পারিবে না।’ উকিল বলিলেন, ‘কিছুই করিবার দরকার নাই, আমাদের রাজ্য লইবার শত্রুদের কোন অধিকার নাই—এই কাথাটি তাহাদের তর্কযুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হউক।’ পুরোহিত বলিলেন, ‘তোমরা

সকলেই বাতুলের মত প্রলাপ বকিতেছ। হোম যাগ কর, স্বস্ত্যয়ন কর, তুলসী দাও, শত্রুরা কিছুই করিতে পারিবে না।' এইরূপে রাজ্য বাঁচাইবার কোন উপায় স্থির না করিয়া তাহারা নিজ নিজ মত লইয়া মহা হুলস্থূল তর্ক আরম্ভ করিল। এ রকম করাই মানুষের স্বভাব!

গল্পটি শুনিয়া আমারও মানুষের মনের একঘেয়ে ঝোঁক সম্বন্ধে একটি কথা মনে পড়িল, স্বামীজীকে বলিলাম, 'স্বামীজী, আমি ছেলেবেলায় পাগলের সহিত আলাপ করিতে বড় ভালবাসিতাম। একদিন একটি পাগল দেখিলাম বেশ বুদ্ধিমান্, ইংরেজীও একটু-আধটু জানে; তার চাই কেবল জল খাওয়া! সঙ্গে একটি ভাঙা ঘটী। যেখানে জল পায়, খাল হউক, হোউজ হউক, নূতন একটা জালের জায়গা দেখিলেই সেখানকার জল পান করিত। আমি তাহাকে এত জল খাবার কারণ জিজ্ঞাসায় সে বলিল, ' Nothing like water, Sir!'—জলের মত কোন জিনিষই নেই, মশাই! তাহাকে আমি একটি ভাল ঘটী দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম, সে উহা কোনমতে লইল না। কারণ জিজ্ঞাসায় বলিল, 'এটি ভাঙা ঘটী বলিয়াই এত দিন আছে। ভাল হইলে অন্যে চুরি করিয়া লইত।'

স্বামীজী গল্প শুনিয়া বলিলেন, 'সে তো বেশ মজার পাগল! ওদের monomaniac বলে। আমাদের সকলেরই ঐ রকম এক-একটা ঝোঁক আছে। আমাদের উহা চাপিয়া রাখিবার ক্ষমতা আছে, পাগলের তাহা নাই। পাগলের সহিত আমাদের এইটুকু মাত্র প্রভেদ। রোগ-শোক-অহঙ্কারে, কাম-ক্রোধ-হিংসায় বা অন্য কোন অত্যাচার বা অনাচারে মানুষ দুর্বল হইয়া ঐ সংযমটুকু হারাইলেই মুশকিল! মনের আবেগ আর চাপিতে পারে না। আমরা তখন বলি, ও লোকটা খেপেছে। এই আর কি!'

স্বামীজীর স্বদেশানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল, এ-কথা পূর্বেই বলিয়াছি। একদিন ঐ সম্বন্ধে কথা উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বলা হয় যে, সংসারী লোকের আপনাপন দেশের প্রতি অনুরাগ নিত্যকর্তব্য হইলেও সন্ন্যাসীর পক্ষে নিজের দেশের মায়া ত্যাগ করা এবং সকল দেশের উপর সমদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া সকল দেশের কল্যাণচিন্তা হৃদয়ে রাখা ভাল। ঐ

কথার উত্তরে স্বামীজী যে জ্বলন্ত কথাগুলি বলেন, তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। তিনি বলিলেন, 'যে আপনার মাকে ভাত দেয় না, সে অন্যের মাকে আবার কি পুষবে?'

আমাদের প্রচলিত ধর্মে, আচার-ব্যবহার, সামাজিক প্রথায় যে অনেক দোষ আছে, স্বামীজী এ কথা স্বীকার করিতেন, বলিতেন, 'সে-সকল সংশোধন করিবার চেষ্টা করা আমাদের সর্বতোভাবে কর্তব্য; কিন্তু তাই বলিয়া সংবাদপত্রে ইংরেজের কাছে সে-সকল ঘোষণা করিবার আবশ্যক কি? ঘরের গলদ বাহিরে যে দেখায়, তাহার মত গর্দভ আর কে আছে? Darty linen must not be exposed in the street.' (ময়লা কাপড়-চোপড় রাস্তার ধারে, লোকের চোখের সামনে রাখাটা উচিত নয়।)

খ্রীষ্টান মিশনরীগণের সম্বন্ধে একদিন কথাবার্তা হয়। তাঁহারা আমাদের দেশে কত উপকার করিয়াছেন ও করিতেছেন, প্রসঙ্গক্রমে আমি এই কথা বলি। শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'কিন্তু অপকারও বড় কম করেন নাই। দেশের লোকের মনের শ্রদ্ধাটি একেবারে গোল্লায় দিবার বিলক্ষণ যোগাড় করিয়াছেন। শ্রদ্ধানাশের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বেরও নাশ হয়। এ-কথা কেহ কি বোঝে? আমাদের দেবদেবীর নিন্দা, আমাদের ধর্মের কুৎসা না করিয়া কি তাঁহাদের নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখান যায় না? আর এক কথা, যিনি যে ধর্মমত প্রচার করিতে চান, তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস ও তদনুযায়ী কাজ করা চাই। অধিকাংশ মিশনরী মুখে এক, কাজে আর। আমি কপটতার উপর ভারি চটা।'

একদিন ধর্ম ও যোগ সম্বন্ধে অনেক কথা অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছিলেন। তাহার মর্ম যতদূর মনে আছে, এইখানে লিখিলামঃ

সকল প্রাণীই সতত সুখী হইবার চেষ্টায় বিব্রত; কিন্তু খুব কম লোকই সুখী। কাজকর্মও সকলে অনবরত করিতেছে; কিন্তু তাহার অভিলাষিত ফল পাইতে প্রায় দেখা যায় না। এরূপ বিপরীত ফল উপস্থিত হইবার কারণ কি, তাহাও সকলে বুঝিবার চেষ্টা করে না। সেইজন্যই মানুষ দুঃখ পায়। ধর্ম সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস হউক না কেন, কেহ যদি ঐ বিশ্বাস-বলে আপনাকে যথার্থ সুখী বলিয়া অনুভব করে, তাহা হইলে তাহার ঐ মত

পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করা কাহারও উচিত নহে, এবং করিলেও তাহাতে সুফল ফলে না। তবে মুখে যে যাহাই বলুক না কেন, যখন দেখিবে কাহারও ধর্ম সম্বন্ধে কথাবার্তা শুনিবারই কেবলমাত্র আগ্রহ আছে, উহার কোন কিছু অনুষ্ঠানের চেষ্টা নাই, তখনই জানিবে যে, তাহার কোন একটা বিষয়ের দৃঢ় বিশ্বাস হয় নাই।

ধর্মের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে সুখী করা। কিন্তু পরজন্মে সুখী হইব বলিয়া ইহজন্মে দুঃখভোগ করাও বুদ্ধিমানের কাজ নহে। এই জন্মে—এই মুহূর্ত হইতেই সুখী হইতে হইবে। যে ধর্ম দ্বারা তাহা সম্পাদিত হইবে, তাহাই মানুষের পক্ষে উপযুক্ত ধর্ম। ইন্দ্রিয়ভোগজনিত সুখ ক্ষণস্থায়ী ও তাহার সহিত অবশ্যম্ভাবী দুঃখও অনিবার্য। শিশু, অজ্ঞান ও পশুপ্রকৃতির লোকেরাই ঐ ক্ষণস্থায়ী দুঃখমিশ্রিত সুখকে বাস্তবিক সুখ মনে করিয়া থাকে। যদি ঐ সুখকেও কেহ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া চিরকাল সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত ও সুখী থাকিতে পারে, তাহাও মন্দ নহে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এরূপ লোক দেখা যায় নাই। সচরাচর ইহাই দেখা যায় যে, যাহারা ইন্দ্রিয়চরিতার্থতাকেই সুখ মনে করে, তাহারা আপনাদের অপেক্ষা ধনবান বিলাসী লোকদের অধিক সুখী মনে করিয়া দ্বেষ করে এবং উচ্চশ্রেণীর বহুব্যয়সাধ্য ইন্দ্রিয়ভোগ দেখিয়া উহা পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া অসুখী হয়। সম্রাট আলেকজেন্দার সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া, পৃথিবীতে আর জয় করিবার দেশ নাই ভাবিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ মনীষীরা অনেক দেখিয়া শুনিয়া বিচার করিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোন একটা ধর্মে যদি পূর্ণ বিশ্বাস হয়, তবেই মানুষ নিশ্চিন্ত ও যথার্থ সুখী হইতে পারে।

বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি সকল বিষয়েই প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। সেই জন্য তাহাদের উপযোগী ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন হওয়া আবশ্যক; নতুবা কিছুতেই উহা তাহাদের সন্তোষপ্রদ হইবে না, কিছুতেই তাহারা উহার অনুষ্ঠান করিয়া যথার্থ সুখী হইতে পারিবে না। নিজ নিজ প্রকৃতির উপযোগী সেই সেই ধর্মমত নিজেকেই ভাবিয়া চিন্তিয়া, দেখিয়া ঠেকিয়া, বাছিয়া লইতে হইবে। উহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ধর্মগ্রন্থপাঠ, গুরূপদেশ, সাধুদর্শন, সৎপুরুষের সঙ্গ প্রভৃতি ঐ বিষয়ে সাহায্য করে মাত্র।

কর্ম সম্বন্ধে জানা আবশ্যক যে, কোন-না-কোন প্রকার কর্ম না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না; কেবল ভাল বা কেবল মন্দ, জগতে এরূপ কোন কর্মই নাই। ভালটা করিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে কিছু না কিছু মন্দ করিতেই হইবে। আর সেজন্য কর্ম দ্বারা যেমন সুখ আসিবে, কিছু-না-কিছু দুঃখ এবং অভাববোধও সেই সঙ্গে আসিবেই আসিবে, উহা অবশ্যম্ভাবী। সে দুঃখটুকু যদি না লইতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বিষয়-ভোগ-জনিত আপাত-সুখলাভের আশাটাও ছাড়িতে হইবে। অর্থাৎ স্বার্থ-সুখ অন্বেষণ না করিয়া কর্তব্যবুদ্ধিতে সকল কার্য করিয়া যাইতে হইবে। উহার নাম নিষ্কাম কর্ম, গীতাতে ভগবান্ অর্জুনকে তাহারই উপদেশ করিয়া বলিতেছেন, 'কাজ কর, কিন্তু ফলটা আমাকে দাও; অর্থাৎ আমার জন্যই কাজ কর।'

গীতা, বাইবেল, কোরান, পুরাণ প্রভৃতি অতি প্রাচীন-গ্রন্থ-নিবদ্ধ ঘটনাবলীর যথাযথ ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে আমার আদৌ বিশ্বাস হইত না। স্বামীজীকে একদিন জিজ্ঞাসা করি, 'কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অনতিপূর্বে অর্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম-উপদেশ, যাহা ভগবদ্গীতায় লিপিবদ্ধ আছে, তাহা যথার্থ ঐতিহাসিক ঘটনা কিনা?' উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বড় সুন্দর। তিনি বলিলেনঃ গীতা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। প্রাচীন কালে ইতিহাস লেখার বা পুস্তকাদি ছাপার এখনকার মত এত ধুমধাম ছিল না; সেজন্য তোমাদের মত লোকের কাছে ভগবদ্গীতার ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণ করা কঠিন। কিন্তু গীতোক্ত ঘটনা যথাযথ ঘটিয়াছিল কিনা, সেজন্য তোমাদের মাথা ঘামাইবার কারণও দেখিতেছি না। কেন না যদি কেহ—শ্রীভগবান্ সারথি হইয়া অর্জুনকে গীতা বলিয়াছিলেন, ইহা অকাট্য প্রমাণ-প্রয়োগে তোমাদের বুঝাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলেই কি তোমরা গীতাতে যাহা কিছু লেখা আছে, তাহা বিশ্বাস করিবে? সাক্ষাৎ ভগবান্ যখন তোমাদের নিকট মূর্তিমান্ হইয়া আসিলেও তোমরা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে ছুট ও তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিতে বল, তখন গীতা ঐতিহাসিক কিনা, এ বৃথা সমস্যা লইয়া কেন ঘুরিয়া বেড়াও? পার যদি তো গীতার উপদেশগুলি যতটা সম্ভব জীবনে পরিণত করিয়া কৃতার্থ হও। পরমহংসদেব বলিতেন, 'আম খা, গাছের পাতা গুণে কি হবে?' আমার বোধ হয় ধর্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ ঘটনার উপর বিশ্বাস-অবিশ্বাস করা is a matter of personal equation

(ব্যক্তিগত ব্যাপার)—অর্থাৎ মানুষ কোন এক অবস্থা-বিশেষে পড়িয়া তাহা হইতে উদ্ধার-কামনায় পথ খুঁজিতে থাকে এবং ধর্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ কোন ঘটনার সহিত তাহার নিজের অবস্থা ঠিক ঠিক মিলিতেছে দেখিতে পাইলে ঐ ঘটনা ঐতিহাসিক বলিয়া নিশ্চয় বিশ্বাস করে। আর ধর্মশাস্ত্রোক্ত ঐ অবস্থার উপযোগী উপায়ও আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে।

শারীরিক এবং মানসিক শক্তি অভীষ্ট কার্যের নিমিত্ত সংরক্ষণ করা যে প্রত্যেকের কতদূর কর্তব্য, স্বামীজী একদিন তাহা অতি সুন্দরভাবে আমাদের বুঝাইয়াছিলেন, 'অনধিকার চর্চায় বা বৃথা কাজে যে শক্তিক্ষয় করে, অভীষ্ট কার্যসিদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত শক্তি সে আর কোথায় পাইবে? The sum-total of the energy which can be exhibted by an ego is a constant quantity—অর্থাৎ প্রত্যেক জীবাত্মার ভিতরে নানাভাবে প্রকাশ করিবার যে শক্তি বর্তমান রহিয়াছে, উহা সীমাবদ্ধ; সুতরাং সেই শক্তির অধিকাংশ একভাবে প্রকাশিত হইলে ততটা আর অন্যভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। ধর্মের গভীর সত্যসকল জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে অনেক শক্তির প্রয়োজন; সেইজন্যই ধর্মপথের পথিকদিগের প্রতি—বিষয়ভোগ ইত্যাদিতে শক্তিক্ষয় না করিয়া ব্রহ্মচর্যাদির দ্বারা শক্তিসংরক্ষণের উপদেশ সকল জাতির ধর্মগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়।'

স্বামীজী বাঙলাদেশের পল্লীগ্রাম ও তথাকার লোকদের কতকগুলি আচরণের উপর বড় একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। পল্লীগ্রামের একই পুষ্করিণীতে স্নান, জলশৌচ প্রভৃতি এবং সেই পুকুরের জলই পান করার প্রথার উপর তিনি ভারি বিরক্ত ছিলেন।

স্বামীজীর এক এক দিনের এইরূপ কথাবার্তা ধরিয়া রাখিতে পারিলে এক একখানি পুস্তক হইত। একই প্রশ্নের বারবার একই ভাবে উত্তর দেওয়া এবং একই দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝান তাঁহার রীতি ছিল না। যতবারই সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেন, ততবারই উহা নূতন ভাবে নূতন দৃষ্টান্ত-সহায়ে এমনি বলিবার ক্ষমতা ছিল যে, উহা সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া লোকের বোধ হইত এবং তাঁহার কথা শুনিতে ক্লান্তিবোধ দূরে থাকুক, আগ্রহ ও অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইত। বক্তৃতা সম্বন্ধেও তাঁহার ঐ প্রথা ছিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিবার বিষয়গুলি (points) লিখিয়া তিনি কোনকালে বক্তৃতা করিতে পারিতেন না। বক্তৃতার

অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত হাসি-তামাসা, সাধারণভাবে কথাবার্তা এবং বক্তৃতার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্বন্ধহীন বিষয়সকল লইয়াও চর্চা করিতেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায়ে হিন্দুধর্ম বুঝাইতে এবং বিজ্ঞান ও ধর্মের সামঞ্জস্য দেখাইতে স্বামীজীর মত আর কাহাকেও দেখা যায় নাই। সে-বিষয়ে দু-চারটি কথা আজ উপহার দিবার ইচ্ছা।

স্বামীজী বলিতেনঃ চেতন অচেতন, স্থূল সূক্ষ্ম—সবই একত্বের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান। প্রথমে মানুষ যত রকম জিনিষ দেখিতে লাগিল, তাহাদের প্রত্যেকটিকে বিভিন্ন জিনিষ মনে করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম দিল। পরে বিচার করিয়া ঐ সমস্ত জিনিষগুলি ৯৩টা মূল দ্রব্য (elements) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, স্থির করিল।

ঐ মূল দ্রব্যগুলির মধ্যে আবার অনেকগুলি মিশ্রদ্রব্য (compound) বলিয়া এখন অনেকের সন্দেহ হইতেছে। আর যখন রসায়ন-শাস্ত্র (Chemistry) শেষ মীমাংসায় পৌঁছিবে, তখন সকল জিনিষই এক জিনিষেরই অবস্থাভেদমাত্র—বোঝা যাইবে। প্রথমে তাপ, আলো ও তড়িৎ (heat, light and electricity) বিভিন্ন শক্তি বলিয়া সকলে জানিত। এখন প্রমাণ হইয়াছে, ঐগুলি সব এক, এক শক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র। লোকে প্রথমে সমস্ত পদার্থ চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিল। তারপর দেখিল যে—উদ্ভিদের প্রাণ আছে, অন্য সকল চেতন প্রাণীর ন্যায় গমনশক্তি নাই মাত্র। তখন খালি দুইটি শ্রেণী রহিল—চেতন ও অচেতন। আবার কিছুদিন পরে দেখা যাইবে, আমরা যাহাকে অচেতন বলি, তাহাদেরও অল্পবিস্তর চৈতন্য আছে১৪।

পৃথিবীতে যে উচ্চ-নিম্ন জমি দেখা যায়, তাহাও সতত সমতল হইয়া একভাবে পরিণত হইবার চেষ্টা করিতেছে। বর্ষার জলে পর্বতাদি উচ্চ জমি ধুইয়া গিয়া গহ্বরসকল পলিতে পূর্ণ হইতেছে। একটা উষ্ণ জিনিষ কোন জায়গায় রাখিলে উহা ক্রমে চতুষ্পার্শ্বস্থ দ্রব্যের ন্যায় সমান উষ্ণভাব ধারণ করিতে চেষ্টা করে। উষ্ণতাশক্তি এইরূপে সঞ্চালন, সংবাহন, বিকিরণাদি (conduction, convection and radiation) উপায়-অবলম্বনে সর্বদা সমভাব বা একত্বের দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

গাছের ফল ফুল পাতা শিকড় আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেখিলেও বাস্তবিক উহারা যে এক, বিজ্ঞান ইহা প্রমাণ করিয়াছে। ত্রিকোণ (prism) কাঁচের মধ্য দিয়া দেখিলে এক সাদা রঙ রামধনুর সাতটা রঙের মত পৃথক্ পৃথক্ বিভক্ত দেখায়। সাদা চক্ষে দেখিলে একই রঙ, আবার লাল বা নীল চশমার ভিতর দিয়া দেখিলে সমস্তই লাল বা নীল দেখায়।

এইরূপ যাহা সত্য, তাহা এক। মায়া দ্বারা আমরা পৃথক্ পৃথক্ দেখি মাত্র। অতএব দেশকালাতীত অবিভক্ত অদ্বৈত সত্যাবলম্বনে মানুষের যত কিছু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থবিজ্ঞান উপস্থিত হইলেও মানুষ সত্যকে ধরিতে পারে না, দেখিতে পায় না।

এইসব কথা শুনিয়া বলিলাম, 'স্বামীজী, আমাদের চোখের দেখাটাই কি সব সময় ঠিক সত্য? দুখানা রেল লাইন সমান্তরালে, দেখায় যেন উহারা ক্রমে এক জায়গায় মিলিয়া গিয়াছে। মরীচিকা, রজ্জুতে সর্পভ্রম প্রভৃতি optical illusion (দৃষ্টিবিভ্রম) সর্বদাই হইতেছে। Fluorspar নামক পাথরের নীচে একটা রেখাকে double refraction-এ দুটো দেখায়। একটা উডপেন্সিল আধ-গ্লাস জলে ডুবাইয়া রাখিলে পেন্সিলের জলমগ্ন ভাগটা উপরের ভাগ অপেক্ষা মোটা দেখায়। আবার সকল প্রাণীর চোখগুলি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতাবিশিষ্ট এক একটা লেন্স (lens) মাত্র। আমরা কোন জিনিষ যত বড় দেখি, ঘোড়া প্রভৃতি অনেক প্রাণী তাহাই তদপেক্ষা বড় দেখিয়া থাকে, কেন না তাহাদের চোখের লেন্স বিভিন্ন শক্তিবিশিষ্ট। অতএব আমরা যাহা স্বচক্ষে দেখি, তাহাই যে সত্য, তাহারও তো প্রমাণ নাই। জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেনঃ মানুষ 'সত্য সত্য', করিয়া পাগল, কিন্তু প্রকৃতি সত্য (Absolute Truth) বুঝিবার ক্ষমতা মানুষের নাই, কারণ ঘটনাক্রমে প্রকৃত সত্য মানুষের হস্তগত হইলে তাহাই যে বাস্তবিক সত্য, ইহা সে বুঝিবে কি করিয়া? আমাদের সমস্ত জ্ঞান relative (আপেক্ষিক), Absolute বুঝিবার ক্ষমতা নাই। অতএব Absolute ভগবান্ বা জগৎকারণকে মানুষ কখনই বুঝিতে পারিবে না।

স্বামীজী॥ তোমার বা সচরাচর লোকের Absolute জ্ঞান না থাকিতে পারে, তাই বলিয়া কাহারও নাই, এমন কথা কি করিয়া বল? অজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া দুইরকম ভাব বা অবস্থা আছে। এখন তোমরা যাহাকে জ্ঞান বল, বাস্তবিক উহা মিথ্যাজ্ঞান। সত্যজ্ঞানের উদয় হইলে উহা অন্তর্হিত হয়, তখন সব এক দেখায়। দ্বৈতজ্ঞান অজ্ঞানপ্রসূত।

আমি॥ স্বামীজী, এ তো বড় ভয়ানক কথা! যদি জ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞান দুইটি জিনিষ থাকে, তাহা হইলে আপনি যাহাকে সত্যজ্ঞান ভাবিতেছেন, তাহাও তো মিথ্যাজ্ঞান হইতে পারে, আর আমাদের যে দ্বৈতজ্ঞানকে আপনি মিথ্যাজ্ঞান বলিতেছিলেন, তাহাও তো সত্য হইতে পারে?

স্বামীজী॥ ঠিক বলিয়াছ, সেইজন্যই বেদে বিশ্বাস করা চাই। পূর্বকালে আমাদের মুনিঋষিগণ সমস্ত দ্বৈতজ্ঞানের পারে গিয়া ঐ অদ্বৈত সত্য অনুভব করিয়া যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাকেই বেদ বলে। স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থার মধ্যে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা অসত্য, আমাদের বিচার করিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই। যতক্ষণ না ঐ দুই অবস্থার পারে গিয়া দাঁড়াইয়া—ঐ দুই অবস্থাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিব, ততক্ষণ কেমন করিয়া বলিব—কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা অসত্য? শুধু দুইটি বিভিন্ন অবস্থার অনুভব হইতেছে, এরূপ বলা যাইতে পারে। এক অবস্থায় যখন থাক, তখন অন্যটাকে ভুল বলিয়া মনে হয়। স্বপ্নে হয়তো কলিকাতায় কেনাবেচা করিলে, উঠিয়া দেখ—বিছানায় শুইয়া আছ। যখন সত্যজ্ঞানের উদয় হইবে, তখন এক ভিন্ন দুই দেখিবে না এবং পূর্বের দ্বৈতজ্ঞান মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারিবে। কিন্তু এ-সব অনেক দূরের কথা, হাতেখড়ি হইতে না হইতেই রামায়ণ মহাভারত পড়িবার ইচ্ছা করিলে চলিবে কেন? ধর্ম অনুভবের জিনিষ, বুদ্ধি দিয়া বুঝিবার নহে। হাতেনাতে করিতে হইবে, তবে ইহার সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবে। এ-কথা তোমাদের পাশ্চাত্য Chemistry (রসায়ন), Physics (পদার্থবিদ্যা), Geology (ভূতত্ত্ববিদ্যা) প্রভৃতির অনুমোদিত। দু-বোতল Hydrogen (উদজান) আর এক বোতল Oxygen (অম্লজান) লইয়া 'জল কই?' বলিলে কি জল হইবে, না তাহাদের একটা শক্ত জায়গায় রাখিয়া electric current (তড়িৎ-প্রবাহ) তাহার ভেতর চালাইয়া তাহাদের combination (সংযোগ, মিশ্রণ নহে) করিলে তবে জল দেখিতে পাইবে এবং বুঝিবে যে, জল hydrogen ও oxygen নামক গ্যাস হইতে উৎপন্ন। অদ্বৈত জ্ঞান উপলব্ধি করিতে গেলেও সেইরূপ ধর্মে বিশ্বাস চাই, আগ্রহ চাই, অধ্যবসায় চাই, প্রাণপণ যত্ন চাই, তবে যদি হয়। এক মাসের অভ্যাস ত্যাগ করাই কত কঠিন, দশ বৎসরের অভ্যাসের তো কথাই নাই।

প্রত্যেক ব্যক্তির শত শত জন্মের কর্মফল পিঠে বাঁধা রহিয়াছে। একমুহূর্ত শ্মশানবৈরাগ্য হইল, আর বলিলে কিনা, 'কই, আমি তো সব এক দেখিতেছি না!'

আমি॥ স্বামীজী, আপনার ঐ কথা সত্য হইলে যে Fatalism (অদৃষ্টবাদ) আসিয়া পড়ে। যদি বহু জন্মের কর্মফল একজন্মে যাইবার নয়, তবে আর চেষ্টা আগ্রহ কেন? যখন সকলের মুক্তি হইবে, তখন আমারও হইবে।

স্বামীজী॥ তাহা নহে। কর্মফল তো অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু অনেক কারণে ঐ-সকল কর্মফল খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হইতে পারে। ম্যাজিক-লণ্ঠনের পঞ্চাশখানা ছবি দশ মিনিটেও দেখান যায়, আবার দেখাইতে দেখাইতে সমস্ত রাতও কাটান যায়। উহা নিজের আগ্রহের উপর নির্ভর করে।

সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধেও স্বামীজীর ব্যাখ্যা অতি সুন্দরঃ সৃষ্ট বস্তুমাত্রেই চেতন ও অচেতন (সুবিধার জন্য) দুইভাগে বিভক্ত। মানুষ সৃষ্ট বস্তুর চেতনভাগের শ্রেষ্ঠ প্রাণিবিশেষ। কোন কোন ধর্মের মতে ঈশ্বর আপনার মত রূপবিশিষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ মানবজাতি নির্মাণ করিয়াছেন; কেহ বলেন, মানুষ লেজবিহীন বানরবিশেষ; কেহ বলেন, মানুষেরই কেবল বিবেচনাশক্তি আছে, তাহার কারণ মানুষের মস্তিষ্কে জলের ভাগ বেশী। যাহাই হউক, মানুষ প্রাণিবিশেষ ও প্রাণিসমূহ সৃষ্ট পদার্থের অংশমাত্র—এ বিষয়ে মতভেদ নাই। এখন সৃষ্ট পদার্থ কি, বুঝিবার জন্য একদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া 'এটা কি, ওটা কি?' অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; আর অন্যদিকে আমাদের পূর্বপুরুষগণ ভারতবর্ষের উষ্ণ আবহাওয়ায় ও উর্বর ভূমিতে শরীর-রক্ষার জন্য যৎসামান্য সময়মাত্র ব্যয় করিয়া কৌপীন পরিয়া প্রদীপের মিটমিটে আলোতে বসিয়া আদা-জল খাইয়া বিচার করিতে লাগিলেন, 'এমন জিনিষ কি আছে, যাহা জানিলে সব জানা যায়?' তাঁহাদের মধ্যে অনেক রকমের লোক ছিলেন। কাজেই চার্বাকের দৃশ্যসত্য মত হইতে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত মত পর্যন্ত সমস্তই আমাদের ধর্মে পাওয়া যায়। দুই দলই ক্রমে এক জায়গায় উপনীত হইতেছেন এবং এখন এক কথাই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দুই দলই বলিতেছেন, এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থই এক অনির্বচনীয় অনাদি অনন্ত বস্তুর প্রকাশমাত্র।

কাল এবং আকাশও (time and space) তাই। কাল অর্থাৎ যুগ, কল্প, বৎসর, মাস, দিন ও মুহূর্ত প্রভৃতি সময়জ্ঞাপক পদার্থ, যাহার অনুভবে সূর্যের গতিই আমাদের প্রধান সহায়, ভাবিয়া দেখিলে সেই কালটাকে কি মনে হয়? সূর্য অনাদি নহে; এমন সময় অবশ্য ছিল, যখন সূর্যের সৃষ্টি হয় নাই। আবার এমন সময় আসিবে, যখন আবার সূর্য থাকিবে না, ইহা নিশ্চিত। তাহা হইলে অখণ্ড সময় একটি অনির্বচনীয় ভাব বা বস্তুবিশেষ ভিন্ন আর কি! আকাশ বা অবকাশ বলিলে আমরা পৃথিবী বা সৌরজগৎ-সম্বন্ধীয় সীমাবদ্ধ জায়গাবিশেষ বুঝি। কিন্তু উহা সমগ্র সৃষ্টির অংশ বৈ আর কিছুই নয়। এমন অবকাশও থাকা সম্ভব, যেখানে কোন সৃষ্ট বস্তুই নাই। অতএব অনন্ত আকাশও সময়ের মত অনির্বচনীয় একটি ভাব বা বস্তুবিশেষ। এখন সৌরজগৎ ও সৃষ্ট বস্তু কোথা হইতে কিরূপে আসিল? সাধারণতঃ আমরা কর্তা ভিন্ন ক্রিয়া দেখিতে পাই না। অতএব মনে করি, এই সৃষ্টির অবশ্য কোন কর্তা আছেন, কিন্তু তাহা হইলে সৃষ্টিকর্তারও সৃষ্টিকর্তা আবশ্যক; তাহা থাকিতে পারে না। অতএব আদিকরণ, সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরও অনাদি অনির্বচনীয় অনন্ত ভাব বা বস্তুবিশেষ। অনন্তের তো বহুত্ব সম্ভবে না, তাই ঐ-সকল অনন্ত পদার্থই এক, এবং একই ঐ-সকলরূপে প্রকাশিত।

এক সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'স্বামীজী, মন্ত্রাদিতে বিশ্বাস—যাহা সাধারণে প্রচলিত আছে, তাহা কি সত্য?'

তিনি উত্তর করিলেন, 'সত্য না হইবার তো কোন কারণ দেখি না। তোমাকে কেহ করুণস্বরে মিষ্টভাষায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তুমি সন্তুষ্ট হও, আর কঠোর তীব্রভাষায় কোন কথা বলিলে তোমার রাগ হয়। তখন প্রত্যেক ভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও যে সুললিত উত্তম শ্লোক (যাকে মন্ত্র বলে) দ্বারা সন্তুষ্ট হইবেন না, তাহার মানে কি?'

এই-সকল কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, 'স্বামীজী, আমার বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় তো আপনি সবই বুঝিতে পারিতেছেন, এখন আমার কি করা কর্তব্য, আপনি বলিয়া দিন।' স্বামীজী বলিলেন, 'প্রথমে মনটাকে বশে আনিতে চেষ্টা কর, তা যে-উপায়েই হোক, পরে সব আপনিই হইবে। আর জ্ঞান—অদ্বৈত জ্ঞান ভারি কঠিন; জানিয়া রাখো যে, উহা

মনুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (highest ideal), কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছিবার পূর্বে অনেক চেষ্টা ও আয়োজনের আবশ্যক। সাধুসঙ্গ ও যথার্থ বৈরাগ্য ভিন্ন উহা অনুভব করিবার অন্য উপায় নাই।'

৪. স্বামীজীর স্মৃতি

[প্রিয়নাথ সিংহ স্বামীজীর বাল্যবন্ধু ও পাড়ার ছেলে; নরেন্দ্রনাথকে ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধাও করিতেন। তিনি কোথায় আছেন, কি করিতেছেন—সব সংবাদ রাখিতেন। আমেরিকায় তাঁহার প্রচার-সাফল্যে আনন্দিত হইয়াছেন, মান্দ্রাজে তাঁহার সম্বর্ধনায় উৎসাহিত হইয়াছেন, কলিকাতায় নিজেরাই তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। এখন নির্জনে বাল্যবন্ধুকে কাছে পাইবার আশায় কাশীপুরে গোপাল লাল শীলের বাগানে আসিয়াছেন।]

অবসর পেয়েই তাঁকে ধরে নিয়ে বাগানে গঙ্গার ধারে বেড়াতে এলুম। তিনিও শৈশবের খেলুড়েকে পেয়ে আগেকার মতই কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। দু-চারটা কথা বলতে না বলতেই ডাকের ওপর ডাক এল যে, অনেক নূতন লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এবার একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বাবা, একটু রেহাই দাও; এই ছেলেবেলাকার খেলুড়ের সঙ্গে দুটো কথা কই, একটু ফাঁকা হাওয়ায় থাকি। যাঁরা এসেছেন, তাঁদের যত্ন করে বসাওগে, তামাক-টামাক খাওয়াওগে।'

যে ডাকতে এসেছিল, সে চলে গেলে জিজ্ঞাসা করলুম, 'স্বামীজী, তুমি সাধু। তোমার অভ্যর্থনার জন্যে যে টাকা আমরা চাঁদা করে তুললুম, আমি ভেবেছিলুম, তুমি দেশের দুর্ভিক্ষের কথা শুনে কলিকাতায় পৌঁছবার আগেই আমাদের 'তার' করবে—আমার অভ্যর্থনায় এক পয়সা খরচ না করে দুর্ভিক্ষ নিবারণী ফণ্ডে ঐ সমস্ত টাকা চাঁদা দাও। কিন্তু দেখলুম, তুমি তা করলে না; এর কারণ কি?'

স্বামীজী বললেন, 'হাঁ, আমি ইচ্ছেই করেছিলুম যে, আমায় নিয়ে একটা খুব হইচই হয়। কি জানিস? একটা হইচই না হলে তাঁর (ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের) নামে লোক চেতবে কি করে? এত ovation (সম্বর্ধনা) কি আমার জন্যে করা হল, না তাঁর নামেরই জয়জয়কার হল? তাঁর বিষয় জানবার জন্যে লোকের মনে কতটা ইচ্ছে হল। এইবার ক্রমে তাঁকে জানবে, তবে না দেশের মঙ্গল হবে! যিনি দেশের মঙ্গলের জন্যে এসেছেন, তাঁকে না

জানলে লোকের মঙ্গল কি করে হবে? তাঁকে ঠিক ঠিক জানলে তবে মানুষ তৈরী হবে, আর মানুষ তৈরী হলে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি তাড়ান কতক্ষণের কথা! আমাকে নিয়ে এই রকম বিরাট সভা করে হইচই করে তাঁকে প্রথমে মানুক—আমার এই ইচ্ছেই হয়েছিল; নতুবা আমার নিজের জন্যে এত হাঙ্গামের কি দরকার ছিল? তোদের বাড়ী গিয়ে যে একসঙ্গে খেলতুম তার চেয়ে আর আমি কি বড়লোক হয়েছি? আমি তখনও যা ছিলুম, এখনও তাই আছি। তুই-ই বল না, আমার কোন পরিবর্তন দেখছিস?'

আমি মুখে বললুম, 'না, সে রকম তো কিছুই দেখছিনি।' তবে মনে হল—সাক্ষাৎ দেবতা হয়েছ।

স্বামীজী বলতে লাগলেন, 'দুর্ভিক্ষ তো আছেই, এখন যেন ওটা দেশের ভূষণ হয়ে পড়েছে। অন্য কোন দেশে দুর্ভিক্ষের এত উৎপাত আছে কি? নেই; কারণ সে-সব দেশে 'মানুষ' আছে। আমাদের দেশের মানুষগুলো একেবারে জড় হয়ে গেছে। তাঁকে দেখে, তাঁকে জেনে লোকে স্বার্থত্যাগ করতে শিখুক, তখন দুর্ভিক্ষ-নিবারণের ঠিক ঠিক চেষ্টা আসবে। ক্রমে সে চেষ্টাও করব, দেখ না।'

আমি॥ আচ্ছা, তুমি এখানে খুব লেকচার-টেকচার দেবে তো? তা না হলে তাঁর নাম কেমন করে প্রচার হবে?

স্বামীজী॥ তুই খেপেছিস, তাঁর নাম-প্রচারের কি কিছু বাকী আছে? লেকচার করে এদেশে কিছু হবে না। বাবুভায়ারা শুনবে, 'বেশ বেশ' করবে, হাততালি দেবে; তারপর বাড়ী গিয়ে ভাতের সঙ্গে সব হজম করে ফেলবে। পচা পুরানো লোহার উপর হাতুড়ির ঘা মারলে কি হবে? ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে; তাকে পুড়িয়ে লাল করতে হবে; তবে হাতুড়ির ঘা মেরে একটা গড়ন করতে পারা যাবে। এদেশে জ্বলন্ত জীবন্ত উদাহরণ না দেখালে কিছুই হবে না। কতকগুলো ছেলে চাই, যারা সব ছেড়েছুড়ে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে। তাদের life আগে তয়ের করে দিতে হবে, তবে কাজ হবে।

আমি॥ আচ্ছা, স্বামীজী, তোমার নিজের দেশের লোক নিজেদের ধর্ম বুঝতে না পেরে কেউ ক্রিশ্চান, কেউ মুসলমান, কেউ বা অন্য কিছু হচ্ছে। তাদের জন্যে তুমি কিছু না করে, গেলে কিনা আমেরিকা ইংলণ্ডে ধর্ম বিলুতে?

স্বামীজী॥ কি জানিস, তোদের দেশের লোকের যথার্থ ধর্ম গ্রহণ করবার শক্তি কি আছে? আছে কেবল একটা অহঙ্কার যে, আমরা ভারি সত্ত্বগুণী। তোরা এককালে সাত্ত্বিক ছিলি বটে, কিন্তু এখন তোদের ভারি পতন হয়েছে? সত্ত্ব থেকে পতন হলে একেবারে তময় আসে। তোরা তাই এসেছিস। মনে করেছিস বুঝি, যে নড়ে না চড়ে না, ঘরের ভেতর বসে হরিনাম করে, সামনে অপরের উপর হাজার অত্যাচার দেখেও চুপ করে থাকে, সেই-ই সত্ত্বগুণী—তা নয়, তাকে মহা তময় ঘিরেছে। যে-দেশের লোক পেটটা ভরে খেতে পায় না, তার ধর্ম হবে কি করে? যে-দেশের লোকের মনে ভোগের কোন আশাই মেটেনি, তাদের নিবৃত্তি কেমন করে হবে? তাই আগে যাতে মানুষ পেটটা ভরে খেতে পায় এবং কিছু ভোগবিলাস করতে পারে, তারই উপায় কর, তবে ক্রমে ঠিক ঠিক বৈরাগ্য এলে ধর্মলাভ হতে পারে। বিলেত-আমেরিকার লোকেরা কেমন জানিস? পূর্ণ রজোগুণী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল রকম ভোগ করে এলে গেছে। তাতে আবার ক্রিশ্চানী ধর্ম—মেয়েলী ভক্তির ধর্ম, পুরাণের ধর্ম! শিক্ষার বিস্তার হওয়াতে তাতে আর তাদের শান্তি হচ্ছে না। তারা যে অবস্থায় আছে, তাতে তাদের একটা ধাক্কা দিয়ে দিলেই সত্ত্বগুণে পৌঁছয়। তারপর আজ একটা লালমুখ এসে যে কথা বলবে, তা তোরা যত মানবি, একটা ছেঁড়ান্যাকড়া-পরা সন্ন্যাসীর কথা তত মানবি কি?

আমি॥ এন. ঘোষও ঠিক ঐ ভাবের কথা বলেছিলেন।

স্বামীজী॥ হাঁ, আমার সেখানকার চেলারা সব যখন তৈরী হয়ে এখানে এসে তোদের বলবে, 'তোমরা কি করছ, তোমাদের ধর্ম-কর্ম রীতি-নীতি কিসে ছোট? দেখ, তোমাদের ধর্মটাই আমরা বড় মনে করি'—তখন দেখিস হুদো লোক সে কথা শুনবে। তাদের দ্বারা এদেশের বিশেষ উপকার হবে। মনে করিসনি, তারা ধর্মের গুরুগিরি করতে এদেশে আসবে। বিজ্ঞান প্রভৃতি ব্যবহারিক শাস্ত্রে তারা তোদের গুরু হবে, আর ধর্মবিষয়ে

এদেশের লোক তাদের গুরু হবে। ভারতের সঙ্গে সমস্ত জগতের ধর্মবিষয়ে এই সম্বন্ধ চিরকাল থাকবে।

আমি॥ তা কেমন করে হবে? ওরা আমাদের যে-রকম ঘৃণা করে, তাতে ওরা যে কখনও নিঃস্বার্থভাবে আমাদের উপকার করবে, তা বোধ হয় না।

স্বামীজী॥ ওরা তোদের ঘৃণা করবার অনেকগুলি কারণ পায়, তাই ঘৃণা করে। একে তো তোরা বিজিত, তার ওপর তোদের মত 'হাঘরের দল' জগতে আর কোথাও নেই। নীচ জাতগুলো তোদের চিরকালের অত্যাচারে উঠতে-বসতে জুতো-লাথি খেয়ে, একেবারে মনুষ্যত্ব হারিয়ে এখন professional (পেশাদার) ভিখিরী হয়েছে; তাদের উপরশ্রেণীর লোকেরা দু-এক পাতা ইংরেজী পড়ে আর্জি হাতে করে সকল আফিসের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা বিশ টাকার চাকরি খালি হলে পাঁচ-শ বি.এ, এম.এ দরখাস্ত করে। পোড়া দরখাস্তও বা কেমন!—'ঘরে ভাত নেই, মাগ-ছেলে খেতে পাচ্ছে না; সাহেব, দুটি খেতে দাও, নইলে গেলুম!' চাকরিতে ঢুকেও দাসত্বের চূড়ান্ত করতে হয়। তোদের উচ্চশিক্ষিত বড় বড় (?) লোকেরা দল বেঁধে 'হায় ভারত গেল! হে ইংরেজ, তোমরা আমাদের লোকদের চাকরি দাও, দুর্ভিক্ষ মোচন কর' ইত্যাদি দিনরাত কেবল 'দাও দাও' করে মহা হল্লা করছে। সকল কথার ধুয়ো হচ্ছে—'ইংরেজ, আমাদের দাও!' বাপু, আর কত দেবে? রেল দিয়েছে, তারের খবর দিয়েছে, রাজ্যে শৃঙ্খলা দিয়েছে, ডাকাতের দল প্রায় তাড়িয়েছে, বিজ্ঞানশিক্ষা দিয়েছে। আবার কি দেবে? নিঃস্বার্থ ভাবে কে কি দেয়? বলি বাপু, ওরা তো এত দিয়েছে, তোরা কি দিয়েছিস?

আমি॥ আমাদের দেবার কি আছে? রাজ্যের কর দিই।

স্বামীজী॥ আ মরি! সে কি তোরা দিস, জুতো মেরে আদায় করে—রাজ্যরক্ষা করে বলে। তোদের যে এত দিয়েছে, তার জন্যে কি দিস—তাই বল। তোদের দেবার এমন জিনিষ আছে, যা ওদেরও নেই। তোরা বিলেত যাবি, তাও ভিখিরী হয়ে, কিনা বিদ্যে দাও। কেউ গিয়ে বড়জোড় তাদের ধর্মের দুটো তারিফ করে এলি, বড় বাহাদুরী হল। কেন, তোদের

দেবার কি কিছু নেই? অমূল্য রত্ন রয়েছে, দিতে পারিস—ধর্ম দে, মনোবিজ্ঞান দে। সমস্ত জগতের ইতিহাস পড়ে দেখ, যত উচ্চ ভাব পূর্বে ভারতেই উঠেছে। চিরকাল ভারত জনসমাজে ভাবের খনি হয়ে এসেছে; ভাব প্রসব করে সমস্ত জগৎকে ভাব বিতরণ করেছে। আজ ইংরেজ ভারতে এসেছে সেই উচ্চ উচ্চ ভাব, সেই বেদান্তজ্ঞান, সেই সনাতন ধর্মের গভীর রহস্য নিতে। তোরা ওদের নিকট যা পাস, তার বিনিময়ে তোদের ঐ-সব অমূল্য রত্ন দান কর। তোদের এই ভিখিরী-নাম ঘুচবার জন্যে ঠাকুর আমাকে ওদের দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। কেবল ভিক্ষে করবার জন্যে বিলেত যাওয়া ঠিক নয়। কেন তোদের চিরকাল ভিক্ষে দেবে? কেউ কখনও দিয়ে থাকে? কেবল কাঙালের মত হাত পেতে নেওয়া জগতের নিয়ম নয়। জগতের নিয়মই হচ্ছে আদান-প্রদান। এই নিয়ম যে-লোক বা যে-জাত বা যে-দেশ না রাখবে, তার কল্যাণ হবে না। সেই নিয়ম আমাদেরও প্রতিপালন করা চাই। তাই আমেরিকায় গিয়েছিলুম। তাদের ভেতর এখন এতদূর ধর্মপিপাসা যে, আমার মত হাজার হাজার লোক গেলেও তাদের স্থান হয়। তারা অনেকদিন থেকে তাদের ধন-রত্ন দিয়েছে, তোরা এখন অমূল্য রত্ন দে। দেখবি, ঘৃণাস্থলে শ্রদ্ধাভক্তি পাবি, আর তোদের দেশের জন্যে তারা অযাচিত উপকার করবে। তারা বীরের জাত, উপকার ভোলে না।

আমি॥ ওদেশে লেকচারে আমাদের কত গুণপনা ব্যাখ্যা করে এসেছ, আমাদের ধর্মপ্রাণতার কত উদাহরণ দিয়েছ! আবার এখন বলছ, আমরা মহা তমোগুণী হয়ে গেছি। অথচ ঋষিদের সনাতন ধর্ম বিলোবার অধিকারী আমাদেরই করছ—এ কেমন কথা?

স্বামীজী॥ তুই কি বলিস, তোদের দোষগুলো দেশে দেশে গাবিয়ে বেড়াব, না তোদের যা গুণ আছে, সেই গুণগুলোর কথাই বলে বেড়াব? যার দোষ তাকেই বুঝিয়ে বলা ভাল, আর তার গুণ দিয়ে ঢাক বাজানই উচিত। ঠাকুর বলতেন যে, মন্দ লোককে 'ভাল ভাল' বললে সে ভাল হয়ে যায়; আর ভাল লোককে 'মন্দ মন্দ'বললে সে মন্দ হয়ে যায়। তাদের দোষের কথা তাদের কাছে খুব বলে এসেছি। এদেশ থেকে যত লোক এ পর্যন্ত ওদেশে গেছে, সকলে তাদের গুণের কথাই গেয়ে এসেছে; আর আমাদের দোষের কথাই

গাবিয়ে বেড়িয়েছে। কাজেই তারা আমাদের ঘৃণা করতে শিখেছে। তাই আমি তোদের গুণ ও তাদের দোষ তাদের দেখিয়েছি। তোরা যত তমোগুণী হোস না কেন, পুরাতন ঋষিদের ভাব তোদের ভেতর একটু-না-একটু আছে—অন্ততঃ তার কাঠামোটা আছে। তবে হুট করে বিলেত গিয়েই যে ধর্ম-উপদেষ্টা হতে পারা যায়, তা নয়। আগে নিরালায় বসে ধর্ম-জীবনটা বেশ করে গড়ে নিতে হবে; পূর্ণভাবে ত্যাগী হতে হবে; আর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য করতে হবে; তোদের ভেতর তমোগুণ এসেছে—তা কি হয়েছে? তমোনাশ কি হতে পারে না? এক কথায় হতে পারে। ঐ তমোনাশ করবার জন্যেই তো ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছেন।

আমি॥ কিন্তু স্বামীজী, তোমার মত কে হবে?

স্বামীজী॥ তোরা ভাবিস, আমি মলে বুঝি আর 'বিবেকানন্দ' হবে না! ঐ যে নেশাখোরগুলো এসে কনসার্ট বাজিয়ে গেল, যাদের তোরা এত ঘৃণা করিস, মহা অপদার্থ মনে করিস, ঠাকুরের ইচ্ছা হলে ওরা প্রত্যেকে এক এক 'বিবেকানন্দ' হতে পারে, দরকার হলে 'বিবেকানন্দে'র অভাব হবে না। কোথা থেকে কত কোটি কোটি এসে হাজির হবে তা কে জানে? এ বিবেকানন্দের কাজ নয় রে; তাঁর কাজ—খোদ রাজার কাজ। একটা গভর্ণর জেনারেল গেলে তাঁর জায়গায় আর একটা আসবেই। তোরা যতই তমোগুণী হোস না কেন, মন মুখ এক করে তাঁর শরণ নিলে সব তমঃ কেটে যাবে। এখন যে ও-রোগের রোজা এসেছে। তাঁর নাম করে কাজে লেগে গেলে তিনি আপনিই সব করে নেবেন। ঐ তমোগুণটাই সত্ত্বগুণ হয়ে দাঁড়াবে।

আমি॥ যাই বল, ও-কথা বিশ্বাস হয় না। তোমার মত Philosophy-তে oratory (দর্শনে বক্তৃতা) করবার ক্ষমতা কার হবে?

স্বামীজী॥ তুই জানিসনি। ও-ক্ষমতা সকলের হতে পারে। যে ভগবানের জন্য বার বছর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য করবে, তারই ও-ক্ষমতা হবে। আমি ঐরূপ করেছি, তাই আমার মাথার ভেতর একটা পর্দা খুলে গিয়েছে। তাই আর আমাকে দর্শনের মত জটিল বিষয়ের বক্তৃতা

ভাবে বার করতে হয় না। মনে কর, কাল বক্তৃতা দিতে হবে, যা বক্তৃতা দেব তার সমস্ত ছবি আজ রাত্রে, পর পর চোখের সামনে দিয়ে যেতে থাকে। পরদিন বক্তৃতার সময় সেই-সব বলি। অতএব বুঝলি তো, এটা আমার নিজস্ব শক্তি নয়। যে অভ্যাস করবে, তারই হবে। তুই কর, তোরও হবে। অমুকের হবে, আর অমুকের হবে না—আমাদের শাস্ত্রে এ-কথা বলে না।

আমি॥ তোমার মনে আছে, তখন তুমি সন্ন্যাস লও নাই, একদিন আমরা একজনের বাড়ীতে বসেছিলুম; তুমি সমাধি ব্যাপারটা আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করছিলে। কলিকালে ও-সব হয় না বলে আমি তোমার কথা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করায় তুমি জোর করে বলেছিলে, 'তুই সমাধি দেখতে চাস, না সমাধিস্থ হতে চাস? আমার সমাধি হয়। আমি তোর সমাধি করে দিতে পারি।' তোমরা এই কথা বলবার পরেই একজন নূতন লোক এসে পড়ল, আর আমদের ঐ-বিষয়ের কোন কথাই চলল না।

স্বামীজী॥ হাঁ, মনে পড়ে।

আমায় সমাধিস্থ করে দেবার জন্যে তাঁকে বিশেষরূপে ধরায় স্বামীজী বললেন, 'দেখ, গত কয়েক বৎসর ক্রমাগত বক্তৃতা দিয়ে আর কাজ করে আমার ভেতর রজোগুণ বড় বেড়ে উঠেছে; তাই সে শক্তি এখন চাপা পড়েছে। কিছুদিন সব কাজ ছেড়ে হিমালয়ে গিয়ে বসলে তবে আবার সে শক্তির উদয় হবে।'

এর দু-এক দিন পরে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করব বলে আমি বাড়ী থেকে বেরুচ্ছি, এমন সময় দুটি বন্ধু এসে জানালেন যে, তাঁরাও স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করে প্রাণায়ামের বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে কাশীপুরের বাগানে এসে উপস্থিত হয়ে দেখলুম, স্বামীজী হাত মুখ ধুয়ে বাইরে আসছেন। শুধু হাতে দেবতা বা সাধু দর্শন করতে যেতে নেই শুনেছিলুম, তাই আমরা কিছু ফল ও মিষ্টান্ন সঙ্গে এনেছিলুম। তিনি আসবামাত্র তাঁকে সেইগুলি দিলুম; স্বামীজী সেগুলি নিয়ে নিজের মাথায় ঠেকালেন এবং আমরা প্রণাম করবার আগেই আমাদের প্রণাম করলেন। আমার সঙ্গের দুটি বন্ধুর মধ্যে একটি

তাঁর সহপাঠী ছিলেন। তাঁকে চিনতে পেরে বিশেষ আনন্দের সহিত তাঁর সমস্ত কুশল জিজ্ঞাসা করলেন, পরে তাঁর নিকটে আমাদের বসালেন। আমরা যেখানে বসলুম, সেখানে আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বামীজীর মধুর কথা শুনতে এসেছেন। অন্যান্য লোকের দু-একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী নিজেই প্রাণায়ামের কথা কইতে লাগলেন। মনোবিজ্ঞান হতেই জড়বিজ্ঞানের উৎপত্তি, বিজ্ঞান-সহায়ে প্রথমে তা বুঝিয়ে পরে প্রাণায়াম বস্তুটা কি, বোঝাতে লাগলেন। এর আগে আমরা কয়জনেই তাঁর 'রাজযোগ' পুস্তকখানি ভাল করে পড়েছিলুম। কিন্তু আজ তাঁর কাছে প্রাণায়াম সম্বন্ধে যে-সকল কথা শুনলাম, তাতে মনে হল তাঁর ভেতরে যা আছে, তার অতি অল্পমাত্রই সেই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

সেদিন আমরা স্বামীজীর কাছে সাড়ে তিনটার সময় উপস্থিত হই। তাঁর প্রাণায়াম-বিষয়ক কথা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত চলেছিল। বাইরে এসে সঙ্গিদ্বয় আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁদের প্রাণের ভেতরের প্রশ্ন স্বামীজী কেমন করে জানতে পারলেন? আমি কি পূর্বেই তাঁকে এ প্রশ্নগুলি জানিয়েছিলুম?

ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন বাগবাজারে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে গিরিশবাবু, অতুলবাবু, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ এবং আরও দু-একটি বন্ধুর সম্মুখে স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'স্বামীজী, সেদিন আমার সঙ্গে যে দু-জন লোক তোমায় দেখতে গিয়েছিল, তুমি এ-দেশে আসবার আগেই তারা তোমার 'রাজযোগ' পড়েছিল আর বলে রেখেছিল যে, যদি তোমার সঙ্গে কখনও দেখা হয় তো তোমাকে প্রাণায়াম-বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু সেদিন তারা কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে না করতেই তুমি তাদের ভেতরের সন্দেহগুলি আপনি তুলে ঐরূপে মীমাংসা করায় তারা আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি তোমাকে তাদের প্রশ্নগুলি আগে জানিয়েছিলুম কিনা।'

স্বামীজী বললেনঃ ওদেশেও অনেক সময়ে ঐরূপ ঘটনা ঘটায় অনেকে আমায় জিজ্ঞাসা করত, 'আপনি আমার অন্তরের প্রশ্ন কেমন করে জানতে পারলেন?' ওটা আমার তত হয় না। ঠাকুরের অহরহ হত।

এই প্রসঙ্গে অতুলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি রাজযোগে বলেছ যে, পূর্বজন্মের কথা সমস্ত জানতে পারা যায়। তুমি নিজে জানতে পার?'

স্বামীজী॥ হাঁ, পারি।

অতুলবাবু॥ কি জানতে পার, বলবার বাধা আছে?

স্বামীজী॥ জানতে পারি—জানি-ও, কিন্তু details (খুঁটিনাটি) বলব না।

* * *

আষাঢ় মাস, সন্ধ্যার কিছু আগে চতুর্দিক অন্ধকার ও ভয়ানক তর্জন-গর্জন করে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। আমরা সেদিন মঠে। শ্রীযুক্ত ধর্মপাল এসেছেন, নূতন মঠ হচ্ছে দেখবেন এবং সেখানে মিসেস বুল আছেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। মঠের বাড়ীটি সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। পুরানো যে দু-তিনটি কুটীর আছে, তাতে মিসেস বুল আছেন। সাধুরা ঠাকুর নিয়ে শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে ভাড়া দিয়ে বাস করছেন। ধর্মপাল বৃষ্টির আগেই সেইখানে স্বামীজীর কাছে এসে উঠেছেন। প্রায় এক ঘণ্টা অতীত হল, বৃষ্টি আর থামে না। কাজেই ভিজে ভিজে নূতন মঠে যেতে হবে। স্বামীজী সকলকে জুতো খুলে ছাতা নিয়ে যেতে বললেন; সকলে জুতো খুললেন। ছেলেবেলার মত শুধু পায় ভিজে ভিজে কাদায় যেতে হবে, স্বামীজীর কতই আনন্দ! একটা খুব হাসি পড়ে গেল। ধর্মপাল কিন্তু জুতো খুললেন না দেখে স্বামীজী তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, 'বড় কাদা, জুতোর দফা রফা হবে।' ধর্মপাল বললেন, ' Never mind, I will wade with my shoes on.' এক এক ছাতা নিয়ে সকলের যাত্রা করা হল। মধ্যে মধ্যে কাহারও পা পিছলয়, তার উপর খুব জোর ঝাপটায় সমস্ত ভিজে যায়, তার মধ্যে স্বামীজীর হাসির রোল; মনে

হল যেন আবার সেই ছেলেবেলার খেলাই বুঝি করছি। যা হোক, অনেক খানা-খন্দল পার হয়ে নূতন মঠের সীমানায় আসা গেল।

সকলের পা হাত ধোয়া হলে মিসেস বুলের কাছে সকলে গিয়ে বসলেন এবং অনেকক্ষণ অনেক বিষয়ে কথাবার্তার পর ধর্মপালের নৌকা এলে সকলে উঠে পড়লাম। নৌকা আমাদের মঠে নামিয়ে দিয়ে ধর্মপালকে নিয়ে কলিকাতা গেল, তখনও বেশ টিপির টিপির বৃষ্টি পড়ছে।

মঠে এসে স্বামীজী তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যদের সঙ্গে ঠাকুরঘরে ধ্যান করতে গেলেন এবং ঠাকুরঘরে ও তার পূর্বদিকের দালানে বসে সকলে ধ্যানে মগ্ন হলেন। আমার আর সেদিন ধ্যান হল না। পূর্বের কথাগুলিই কেবল মনে পড়তে লাগল। ছেলেবেলায় মুগ্ধ হয়ে দেখতাম, এই অদ্ভুত বালক নরেন আমাদের সঙ্গে কখনও হাসছে, খেলছে, গল্প করছে, আবার কখনও বা সকলের মনোমুগ্ধকর কিন্নরস্বরে গান করছে। ক্লাসে তো বরাবর first (প্রথম) হত। খেলাতেও তাই, ব্যায়ামেও তাই, বালকগণের নেতৃত্বেও তাই, গানেতে তো কথাই নাই—গন্ধর্বরাজ!

স্বামীজীরা ধ্যান থেকে উঠলেন। বড় ঠাণ্ডা, একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে স্বামীজী তানপুরা ছেড়ে গান ধরলেন। তারপর সঙ্গীতের উপর অনেক কথা চলল। স্বামী শিবানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিলাতী সঙ্গীত কেমন?'

স্বামীজী॥ খুব ভাল, harmony-র চূড়ান্ত, যা আমাদের মোটেই নেই। তবে আমাদের অনভ্যস্ত কানে বড় ভাল লাগে না। আমারও ধারণা ছিল যে, ওরা কেবল শেয়ালের ডাক ডাকে। যখন বেশ মন দিয়ে শুনতে আর বুঝতে লাগলুম, তখন অবাক হলুম। শুনতে শুনতে মোহিত হয়ে যেতাম। সকল art-এরই তাই। একবার চোখ বুলিয়ে গেলে একটা খুব উৎকৃষ্ট ছবির কিছু বুঝতে পারা যায় না। তার উপর একটু শিক্ষিত চোখ নইলে তো তার অগ্নি-সন্ধি কিছুই বুঝবে না। আমাদের দেশের যথার্থ সঙ্গীত কেবল কীর্তনে আর ধ্রুপদে আছে। আর সব ইসলামী ছাঁচে ঢালা হয়ে বিগড়ে গেছে। তোমরা ভাবো, ঐ যে

বিদ্যুতের মত গিটকিরি দিয়ে নাকী সুরে টপ্পা গায়, তাই বুঝি দুনিয়ার সেরা জিনিষ। তা নয়। প্রত্যেক পর্দায় সুরের পূর্ণবিকাশ না করলে music-এ (গানে) science (বিজ্ঞান) থাকে না। Painting-এ (চিত্রশিল্পে) nature (প্রকৃতি)-কে বজায় রেখে যত artistic (সুন্দর) কর না কেন ভালই হবে, দোষ হবে না। তেমনি music-এর science বজায় রেখে যত কারদানি কর, ভাল লাগবে। মুসলমানেরা রাগরাগিণীগুলোকে নিলে এদেশে এসে। কিন্তু টপ্পাবাজিতে তাদের এমন একটা নিজেদের ছাপ ফেললে যে, তাতে science আর রইল না।

প্রশ্ন॥ কেন science মারা গেল? টপ্পা জিনিষটা কার না ভাল লাগে?

স্বামীজী॥ ঝিঁঝি পোকার রবও খুব ভাল লাগে। সাঁওতালরাও তাদের music অত্যুৎকৃষ্ট বলে জানে। তোরা এটা বুঝতে পারিস না যে, একটা সুরের ওপর আর একটা সুর এত শীঘ্র এসে পড়ে যে, তাতে আর সঙ্গীতমাধুর্য (music) কিছুই থাকে না, উল্টে discordance (বে-সুর) জন্মায়। সাতটা পর্দার permutation, combination (পরিবর্তন ও সংযোগ) নিয়ে এক-একটা রাগরাগিণী হয় তো? এখন টপ্পায় এক তুড়িতে সমস্ত রাগটার আভাস দিয়ে একটা তান সৃষ্টি করলে আবার তার ওপর গলায় জোয়ারী বলালে কি করে আর তার রাগত্ব থাকবে? আর টোকরা তানের এত ছড়াছড়ি করলে সঙ্গীতের কবিত্ব-ভাবটা তো একেবারে যায়। টপ্পার যখন সৃষ্টি হয়, তখন গানের ভাব বজায় রেখে গান গাওয়াটা দেশ থেকে একেবারে উঠে গিয়েছিল! আজকাল থিয়েটারের উন্নতির সঙ্গে সেটা যেমন একটু ফিরে আসছে, তেমনি কিন্তু রাগরাগিণীর শ্রাদ্ধটা আরও বিশেষ করে হচ্ছে।

এইজন্য যে ধ্রুপদী, সে টপ্পা শুনতে গেলে তার কষ্ট হয়। তবে আমাদের সঙ্গীতে cadence (মিড় মূর্চ্ছনা) বড় উৎকৃষ্ট জিনিষ। ফরাসীরা প্রথমে ওটা ধরে, আর নিজেদের music-এ ঢুকিয়ে নেবার চেষ্টা করে। তারপর এখন ওটা ইওরোপে সকলেই খুব আয়ত্ত করে নিয়েছে।

প্রশ্ন॥ ওদের music-টা কেবল martial (রণবাদ্য) বলে বোধ হয়, আর আমাদের সঙ্গীতের ভিতর ঐ ভাবটা আদতেই নেই যেন।

স্বামীজী॥ আছে, আছে। তাতে harmony-র (ঐকতানের) বড় দরকার। আমাদের hormony-র বড় অভাব, এই জন্যই ওটা অত দেখা যায় না, আমাদের music-এর খুবই উন্নতি হচ্ছিল, এমন সময়ে মুসলমানেরা এসে সেটাকে এমন করে হাতালে যে, সঙ্গীতের গাছটি আর বাড়তে পেলে না। ওদের (পাশ্চাত্যের) music খুব উন্নত, করুণরস বীররস– দুই আছে, যেমন থাকা দরকার। আমাদের সেই কদুকলের আর উন্নতি হল না।

প্রশ্ন॥ কোন্ রাগরাগিণীগুলি martial?

স্বামীজী॥ সকল রাগই martial হয়, যদি harmony-তে বসিয়ে নিয়ে যন্ত্রে বাজান যায়। রাগিণীর মধ্যেও কতকগুলি হয়।

ইতোমধ্যে ঠাকুরের ভোগ হলে পর সকলে ভোজন করতে গেলেন। আহারের পর কলিকাতার যে-সকল লোক সেই রাত্রে মঠে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের শয়নের বন্দোবস্ত করে দিয়ে তারপর স্বামীজী নিজে শয়ন করতে গেলেন।

* * *

প্রায় দুই বৎসর নূতন মঠ হয়েছে, সাধুরা সেইখানেই আছেন। একদিন প্রাতে আমি গুরুদর্শনে গেছি। স্বামীজী আমায় দেখে হাসতে হাসতে তন্ন তন্ন করে সমস্ত কুশল এবং কলিকাতার সমস্ত খবর জিজ্ঞাসা করে বললেন, 'আজ থাকবি তো?'

আমি 'নিশ্চয়' বলে অন্যান্য অনেক কথার পর স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ছোট ছেলেদের শিক্ষা দেবার বিষয়ে তোমার মত কি?'

স্বামীজী॥ গুরুগৃহে বাস।

প্রশ্ন॥ কি রকম?

স্বামীজী॥ সেই পুরাকালের বন্দোবস্ত। তবে তার সঙ্গে আজকালের পাশ্চাত্য দেশের জড়বিজ্ঞানও চাই। দুটোই চাই।

প্রশ্ন॥ কেন, আজকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীতে কি দোষ?

স্বামীজী॥ প্রায় সবই দোষ, কেবল চূড়ান্ত কেরানী-গড়া কল বৈ তো নয়। কেবল তাই হলেও বাঁচতুম। মানুষগুলো একেবারে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-বর্জিত হচ্ছে। গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলবে; বেদকে চাষার গান বলবে। ভারতের বাইরে যা কিছু আছে, তার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখে, নিজের কিন্তু সাত পুরুষ চুলোয় যাক—তিন পুরুষের নামও জানে না।

প্রশ্ন॥ তাতে কি এসে গেল? নাই বা বাপ-দাদার নাম জানলে?

স্বামীজী॥ না রে; যাদের দেশের ইতিহাস নেই, তাদের কিছুই নেই। তুই মনে কর না, যার 'আমি এত বড় বংশের ছেলে' বলে একটা বিশ্বাস ও গর্ব থাকে, সে কি কখনও মন্দ হতে পারে? কেমন করে হবে বল না? তার সেই বিশ্বাসটা তাকে এমন রাশ টেনে রাখবে যে, সে মরে গেলেও একটা মন্দ কাজ করতে পারবে না। তেমনি একটা জাতির ইতিহাস সেই জাতটাকে টেনে রাখে, নীচু হতে দেয় না। আমি বুঝেছি, তুই বলবি আমাদের history (ইতিহাস) তো নেই। তোদের মতে নেই। তোদের University-র (বিশ্ববিদ্যালয়ের) পণ্ডিতদের মতে নেই, আর এক দৌড়ে বিলেতে বেড়িয়ে এসে সাহেব সেজে যারা বলে, 'আমাদের কিছুই নেই, আমরা বর্বর', তাদের মতে নেই। আমি বলি, অন্যান্য দেশের মত নেই। আমরা ভাত খাই, বিলেতের লোকে ভাত খায় না; তাই বলে কি তারা উপোস করে মরে ভূত হয়ে আছে? তাদের দেশে যা আছে, তারা তাই খায়। তেমনি তোদের দেশের ইতিহাস যেমন থাকা দরকার হয়েছিল, তেমনি আছে। তোরা চোখ বুজে 'নেই নেই' বলে চেঁচালে কি ইতিহাস লুপ্ত হয়ে যাবে? যাদের চোখ আছে সেই জ্বলন্ত ইতিহাসের বলে এখনও সজীব আছে। তবে সেই ইতিহাসকে নূতন ছাঁচে ঢালাই করে নিতে হবে। এখনও

পাশ্চাত্য শিক্ষার চোটে লোকের যে বুদ্ধিটি দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই বুদ্ধির মত উপযুক্ত করে ইতিহাসটাকে নিতে হবে।

প্রশ্ন॥ সে কেমন করে হবে?

স্বামীজী॥ সে অনেক কথা। আর সেই জন্যই 'গুরুগৃহবাস' ইত্যাদি চাই। চাই Western Science-এর (পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের) সঙ্গে বেদান্ত, আর মূলমন্ত্র—ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা আর আত্মপ্রত্যয়। আর কি জানিস, ছোট ছেলেদের 'গাধা পিটে ঘোড়া করা'-গোছ শিক্ষা দেওয়াটা তুলে দিতে হবে একেবারে।

প্রশ্ন॥ তার মানে?

স্বামীজী॥ ওরে, কেউ কাকেও শেখাতে পারে না। 'শেখাচ্ছি' মনে করেই শিক্ষক সব মাটি করে। কি জানিস, বেদান্ত বলে—এই মানুষের ভেতরেই সব আছে। একটা ছেলের ভেতরেও সব আছে। কেবল সেইগুলি জাগিয়ে দিতে হবে, এইমাত্র শিক্ষকের কাজ। ছেলেগুলো যাতে নিজ নিজ হাত-পা নাক-কান মুখ-চোখ ব্যবহার করে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নিতে শেখে, এইটুকু করে দিতে হবে। তা হলেই আখেরে সবই সহজ হয়ে পড়বে। কিন্তু গোড়ার কথা—ধর্ম। ধর্মটা যেন ভাত, আর সবগুলো তরকারি। কেবল শুধু তরকারি খেয়ে হয় বদহজম, শুধু ভাতেও তাই। মেলা কতকগুলো কেতাবপত্র মুখস্থ করিয়ে মনিষ্যিগুলোর মুণ্ডু বিগড়ে দিচ্ছিল। এক দিক্ দিয়ে দেখলে তোদের বড়লাটের উপর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। High education (উচ্চশিক্ষা) তুলে দিচ্ছে বলে দেশটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। বাপ্! কি পাসের ধুম, আর দুদিন পরেই সব ঠাণ্ডা! শিখলেন কি?—না নিজেদের সব মন্দ, সাহেবদের সব ভাল। শেষে অন্ন জোটে না। এমন high education (উচ্চশিক্ষা) থাকলেই কি, আর গেলেই বা কি? তার চেয়ে একটু technical education (কারিগরী শিক্ষা) পেলে লোকগুলো কিছু করে খেতে পারবে; চাকরি চাকরি করে আর চেঁচাবে না।

প্রশ্ন॥ মারোয়াড়ীরা বেশ—চাকরি করে না, প্রায় সকলেই ব্যবসা করে।

স্বামীজী॥ দূর, ওরা দেশটা উৎসন্ন দিতে বসেছে। ওদের বড় হীন বুদ্ধি। তোরা ওদের চেয়ে অনেক ভালো—manufacture-এর (শিল্পজাত দ্রব্য-নির্মাণের) দিকে নজর বেশী। ওরা যে টাকাটা খাটিয়ে সামান্য লাভ করে আর গৌরাঙ্গের পেট ভরায়, সেই টাকায় যদি গোটাকতক factory (শিল্পশালা), workshop (কারখানা) করে, তা হলে দেশেরও কল্যাণ হয় আর ওদের এর চেয়ে অনেক বেশী লাভ হয়। চাকরি বোঝে না কাবলীরা—স্বাধীনতার ভাব হাড়ে হাড়ে। ওদের একজনকে চাকরির কথা বলে দেখিস না!

প্রশ্ন॥ High education (উচ্চশিক্ষা) তুলে দিলে সব মানুষগুলো যেমন গরু ছিল, তেমনি আবার গরু হয়ে দাঁড়াবে যে!

স্বামীজী॥ রাম কহ! তাও কি হয় রে? সিঙ্গি কি কখনও শেয়াল হয়? তুই বলিস কি? যে-দেশ চিরকাল জগৎকে বিদ্যা দিয়ে এসেছে, লর্ড কার্জন high education (উচ্চশিক্ষা) তুলে দিলে বলে কি দেশসুদ্ধ লোক গরু হয়ে দাঁড়াবে!

প্রশ্ন॥ যখন ইংরেজ এদেশে আসেনি, তখন দেশের লোক কি ছিল? আজও কি আছে?

স্বামীজী॥ কলকব্জা তয়ের করতে শিখলেই high education হল না। Life-এর problem solve (জীবনের সমস্যার সমাধান) করা চাই—যে-কথা নিয়ে আজকাল সভ্য জগৎ গভীর গবেষণায় মগ্ন, আর যেটার সিদ্ধান্ত আমাদের দেশে হাজার বৎসর আগে হয়ে গেছে।

প্রশ্ন॥ তবে তোমারা সেই বেদান্তও তো যেতে বসেছিল?

স্বামীজী॥ হাঁ। সময়ে সময়ে সেই বেদান্তের আলো একটু নেব-নেব হয়, আর সেইজন্যই ভগবানের আসবার দরকার হয়। আর তিনি এসে সেটাতে এমন একটা শক্তি সঞ্চার করে দিয়ে যান যে, আবার কিছুকালের জন্য তার আর মার থাকে না। এখন সেই শক্তি এসে গেছে। তোদের বড়লাট high education (উচ্চশিক্ষা) তুলে দিলে ভালই হবে।

প্রশ্ন॥ ভারত যে সমগ্র জগৎকে বিদ্যা দিয়ে এসেছে, তার প্রমাণ কি?

স্বামীজী॥ ইতিহাসই তার প্রমাণ। এই ব্রহ্মাণ্ডে যত soul-elevating ideas (মানবমনের উন্নয়নকারী ভাবসমূহ) বেরিয়েছে আর যত কিছু বিদ্যা আছে, অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যায়, তার মূল সব ভারতে রয়েছে।

এই কথা বলতে বলতে তিনি যেন মেতে উঠলেন। একে তো শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, তার ওপর দারুণ গ্রীষ্ম, মুহুর্মুহুঃ পিপাসা পেতে লাগল। অনেকবার জল পান করলেন। এবার বললেন, 'সিংহ, একটু বরফজল খাওয়া। তোকে সব বুঝিয়ে বলছি?'

জল পান করে আবার বললেন—'আমাদের চাই কি জানিস?—স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর science (বিজ্ঞান) পড়ান; চাই technical education (কারিগরী শিক্ষা), চাই যাতে industry (শিল্প) বাড়ে; লোকে চাকরি না করে দু-পয়সা করে খেতে পারে।'

প্রশ্ন॥ সেদিন টোলের কথা কি বলছিলে?

স্বামীজী॥ উপনিষদের গল্পটল্প পড়েছিস? সত্যকাম১৫ গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য করতে গেলেন। গুরু তাঁকে কতকগুলি গরু দিয়ে বনে চরাতে পাঠালেন। অনেকদিন পরে যখন গুরুর সংখ্যা দ্বিগুণ হল, তখন তিনি গুরুগৃহে ফেরবার উপক্রম করলেন। এই সমস্ত একটি গরু, অগ্নি এবং অন্যান্য কতকগুলি জন্তু তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। যখন শিষ্য গুরুর বাড়ী ফিরে এলেন, তখন গুরু তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারলেন, শিষ্যের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছে। এই গল্পের মানে এই—প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত বাস করলে তা থেকেই যথার্থ শিক্ষা পাওয়া যায়।

সেই-রকম করে বিদ্যা উপার্জন করতে হবে; শিরোমণি মহাশয়ের টোলে পড়লে রূপী বাঁদরটি থাকবে। একটা জ্বলন্ত character-এর (চরিত্রের) কাছে ছেলেবেলা থেকেই থাকা চাই, জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা চাই। কেবল 'মিথ্যা কথা কহা বড় পাপ' পড়লে কচুও হবে না। Absolute (অখণ্ড) ব্রহ্মচর্য করাতে হবে প্রত্যেক ছেলেটাকে, তবে না শ্রদ্ধা বিশ্বাস আসবে। নইলে যার শ্রদ্ধা বিশ্বাস নেই, সে মিছে কথা কেন কইবে না? আমাদের দেশে চিরকাল ত্যাগী লোকের দ্বারাই বিদ্যার প্রচার হয়েছে। পণ্ডিত মশাইরা হাত বাড়িয়ে বিদ্যাটা টেনে

নিয়ে টোল খুলেই দেশের সর্বনাশটা করে বসেছেন। যতদিন ত্যাগীরা বিদ্যাদান করেছেন, ততদিন ভারতের কল্যাণ ছিল।

প্রশ্ন॥ এর মানে কি? আর সব দেশে তো ত্যাগী সন্ন্যাসী নেই, তাদের বিদ্যার বলে যে ভারত জুতোর তলে

স্বামীজী॥ ওরে বাপ চেল্লাসনি, যা বলি শোন। ভারত চিরকাল মাথায় জুতো বইবে, যদি ত্যাগী সন্ন্যাসীদের হাতে আবার ভারতকে বিদ্যা শেখাবার ভার না পড়ে। জানিস, একটা নিরক্ষর ত্যাগী ছেলে তেরকেলে বুড়ো পণ্ডিতদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পা পূজারী ভেঙে ফেলে। পণ্ডিতরা এসে সভা করে পাঁজিপুঁথি খুলে বললে, 'এ ঠাকুরের সেবা চলবে না, নূতন ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করতে হবে।' মহা হুলস্থুল ব্যাপার। শেষে পরমহংস মশাইকে ডাকা হল। তিনি বললেন, 'স্বামীর যদি পা খোঁড়া হয়ে যায়, তাহলে কি স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করে?' পণ্ডিত বাবাজীদের আর টীকে-টিপ্পুনী চলল না। ওরে আহাম্মক, তা যদি হবে তো পরমহংস মহাশয় আসবেন কেন? আর বিদ্যাটাকে এত উপেক্ষা করবেন কেন? বিদ্যাশিক্ষায় তাঁর সেই নূতন শক্তিসঞ্চার চাই; তবে ঠিক ঠিক কাজ হবে।

প্রশ্ন॥ সে তো সহজ কথা নয়। কেমন করে হবে?

স্বামীজী॥ সহজ হলে তাঁর আসবার দরকার হত না। এখন তোদের করতে হবে কি জানিস? প্রতি গ্রামের প্রতি শহরে মঠ খুলতে হবে। পারিস কিছু করতে? কিছু কর। কলিকাতায় একটা বড় করে মঠ কর। একটা করে সুশিক্ষিত সাধু থাকবে সেখানে, তার তাঁবে practical science (ব্যবহারিক বিজ্ঞান) ও সব রকম art (কলাকৌশল) শেখাবার জন্য প্রত্যেক branch-এ (বিভাগ) specialist (বিশেষজ্ঞ) সন্ন্যাসী থাকবে।

প্রশ্ন॥ সে-রকম সাধু কোথায় পাবে?

স্বামীজী॥ তয়ের করে নিতে হবে। তাই তো বলি কতকগুলি স্বদেশানুরাগী ত্যাগী ছেলে চাই। ত্যাগীরা যত শীঘ্র এক-একটা বিষয় চূড়ান্ত রকমে শিখে নিতে পারবে, তেমন তো আর কেউ পারবে না।

তারপর স্বামীজী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে তামাক খেতে লাগলেন। পরে বলে উঠলেন, 'দেখ সিঙ্গি, একটা কিছু কর। দেশের জন্য করবার এত কাজ আছে যে, তোর আমার মত হাজার হাজার লোকের দরকার। শুধু গপ্পিতে কি হবে? দেশের মহা দুর্গতি হয়েছে, কিছু কর রে। ছোট ছেলেদের পড়বার উপযুক্ত একখানাও কেতাব নেই।'

প্রশ্ন॥ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তো অনেকগুলি বই আছে।

এই কথা বলবামাত্র স্বামীজী উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বললেনঃ 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ', 'গোপাল অতি সুবোধ বালক'—ওতে কোন কাজ হবে না। ওতে মন্দ বৈ ভাল হবে না। রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ্ থেকে ছোট ছোট গল্প নিয়ে অতি সোজা ভাষায় কতকগুলি বাঙলাতে আর কতকগুলি ইংরেজীতে কেতাব করা চাই। সেইগুলি ছোট ছেলেদের পড়াতে হবে।

বেলা প্রায় ১১টা; ইতঃপূর্ব পশ্চিমদিকে একখানা মেঘ দেখা দিয়েছিল। এখন সেই মেঘ স্বন্ স্বন্ শব্দে চলে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে বেশ শীতল বাতাস উঠল। স্বামীজীর আর আনন্দের শেষ নাই; বৃষ্টি হবে। তিনি উঠে 'সিঙ্গি, আয় গঙ্গার ধারে যাই' বলে আমাকে নিয়ে ভাগীরথীতীরে বেড়াতে লাগলেন। কালিদাসের মেঘদূত থেকে কত শ্লোক আওড়ালেন, কিন্তু মনে মনে সেই একই চিন্তা করছিলেন—ভারতের মঙ্গল। বললেন, 'সিঙ্গি, একটা কাজ করতে পারিস? ছেলেগুলোর অল্প বয়সে বে বন্ধ করতে পারিস?'

আমি উত্তর করলাম, 'বে বন্ধ করা চুলোয় যাক, বাবুরা যাতে বে সস্তা হয়, তার ফিকির করছেন।'

স্বামীজী॥ খেপেছিস, কার সাধ্যি সময়ের ঢেউ ফেরায়! ঐ হইচই-ই সার। বে যত মাগগি হয়, ততই মঙ্গল। যেমন পাশের ধুম, তেমনি কি বিয়ের ধুম! মনে হয় বুঝি আইবুড়ো আর রহিল না! পরের বছর আবার তেমনি।

স্বামীজী আবার খানিক চুপ করে থেকে পুনরায় বললেন, 'কতকগুলি অবিবাহিত graduate (গ্রাজুয়েট) পাই তো জাপানে পাঠাই, যাতে তারা সেখানে কারিগরী শিক্ষা (technical education) পেয়ে আসে। যদি এরূপ চেষ্টা করা যায়, তা হলে বেশ হয়!'

প্রশ্ন॥ কেন? বিলেত যাওয়ার চেয়ে কি জাপান যাওয়া ভাল?

স্বামীজী॥ সহস্রগুণে! আমি বলি এদেশের সমস্ত বড় লোক আর শিক্ষিত লোকে যদি একবার করে জাপান বেড়িয়ে আসে তো লোকগুলোর চোখ ফোটে।

প্রশ্ন॥ কেন?

স্বামীজী॥ সেখানে এখানকার মত বিদ্যার বদহজম নেই। তারা সাহেবদের সব নিয়েছে, কিন্তু তারা জাপানীই আছে, সাহেব হয়নি। তোদের দেশে সাহেব হওয়া যে একটা বিষম রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি॥ আমি কতকগুলি জাপানী ছবি দেখেছি। তাদের শিল্প দেখে অবাক হতে হয়। আর তার ভাবটি যেন তাদের নিজস্ব বস্তু, কারও নকল করবার যো নেই।

স্বামীজী॥ ঠিক। ঐ আর্টের জন্যই ওরা এত বড়। তারা যে Asiatic (এশিয়াবাসী)। আমাদের দেখছিস না সব গেছে, তবু যা আছে তা অদ্ভুত। এশিয়াটিকের জীবন আর্টে মাখা। কোন বস্তুতে আর্ট না থাকলে এশিয়াটিক তা ব্যবহার করে না। ওরে, আমাদের আর্টও যে ধর্মের একটা অঙ্গ। যে-মেয়ে ভাল আলপনা দিতে পারে, তার কত আদর! ঠাকুর নিজে একজন কত বড় artist (শিল্পী) ছিলেন।

প্রশ্ন॥ সাহেবদেরও তো art (শিল্প) বেশ।

স্বামীজী॥ দূর মূর্খ! আর তোরেই বা গাল দিই কেন? দেশের দশাই এমনি হয়েছে। দেশসুদ্ধ লোক নিজের সোনা রাঙ, আর পরের রাঙটা সোনা দেখছে। এটা হচ্ছে আজকালকার শিক্ষার ভেলকি। ওরে, ওরা যতদিন এশিয়ায় এসেছে, ততদিন ওরা চেষ্টা করছে জীবনে art (শিল্প) ঢোকাতে।

আমি॥ এ-রকম কথা শুনলে লোকে বলবে, তোমার সব pessimistic view (নৈরাশ্যবাদী মত)

স্বামীজী॥ কাজেই তাই বৈকি! আমার ইচ্ছে করে, আমার চোখ দিয়ে তোদের সব দেখাই। ওদের বাড়ীগুলো দেখ সব সাদামাটা। তার কোন মানে পাস? দেখ না—এই যে এত বড় সব বাড়ী government-এর (সরকারের) রয়েছে, বাইরে থেকে দেখলে তার কোন মানে বুঝিস, বলতে পারিস? তারপর তাদের প্যাণ্ট চোস্ত কোট, আমাদের হিসেবে এক প্রকার ন্যাংটো। না? আর তার কি যে বাহার! আমাদের জন্মভূমিটা ঘুরে দেখ। কোন্ building-টার (অট্টালিকার) মানে না বুঝতে পারিস, আর তাতে কিবা শিল্প! ওদের জলখাবার গেলাস, আমাদের ঘটী—কোনটায় আর্ট আছে? ওরে, একটুকরা Indian silk (ভারতীয় রেশম) চায়না (China)-য় নকল করতে হার মেনে গেল। এখন সেটা Japan (জাপান) কিনে নিলে ২০,০০০ টাকায়, যদি তারা পারে চেষ্টা করে। পাড়াগাঁয়ে চাষাদের বাড়ী দেখেছিস?

উত্তর॥ হাঁ।

স্বামীজী॥ কি দেখেছিস?

আমি॥ বেশ নিকন-চিকন পরিষ্কার।

স্বামীজী॥ তাদের ধানের মরাই দেখেছিস? তাতে কত আর্ট! মেটে ঘরগুলো কত চিত্তির-বিচিত্তির! আর সাহেবদের দেশে ছোটলোকেরা কেমন থাকে তাও দেখে আয়। কি জানিস, সাহেবদের utility (কার্যকারিতা) আর আমাদের art (শিল্প)—ওদের সমস্ত দ্রব্যেই utility, আমাদের সর্বত্র আর্ট। ঐ সাহেবী শিক্ষায় আমাদের অমন সুন্দর চুমকি ঘটী ফেলে এনামেলের গেলাস এনেছেন ঘরে। ওই রকমে utility এমনভাবে আমাদের ভেতর

ঢুকেছে যে, সে বদহজম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন চাই art এবং utility-র combination (সংযোগ)। জাপান সেটা বড় চট করে নিয়ে ফেলেছে, তাই এত শীঘ্র বড় হয়ে পড়েছে। এখন আবার ওরা তোমার সাহেবদের শেখাবে।

প্রশ্ন॥ কোন্ দেশের কাপড় পরা ভাল?

স্বামীজী॥ আর্যদের ভাল। সাহেবরাও এ-কথা স্বীকার করে। কেমন পাটে পাটে সাজান পোষাক। যত দেশের রাজ-পরিচ্ছদ এক রকম আর্য-জাতিদের নকল, পাটে-পাটে রাখবার চেষ্টা, আর তা জাতীয় পোষাকের ধারেও যায় না। দেখ সিঙ্গি, ঐ হতভাগা শার্টগুলো পরা ছাড়।

প্রশ্ন॥ কেন?

স্বামীজী॥ আরে ওগুলো সাহেবদের underwear (অধোবাস)। সাহেবরা ঐগুলো পরা ঘৃণা করে। কি হতভাগা দশা বাঙালীর! যা হোক একটা পরলেই হল? কাপড় পরার যেন মা-বাপ নেই। কারুর ছোঁয়া খেলে জাত যায়, বেচালের কাপড়চোপড় পরলেও যদি জাত যেত তো বেশ হত। কেন, আমাদের নিজের মত কিছু করে নিতে পারিস না? কোট, শার্ট গায় দিতেই হবে, এর মানে কি?

বৃষ্টি এল; আমাদেরও প্রসাদ পাবার ঘণ্টা পড়ল। 'চল, ঘণ্টা দিয়েছে' বলে স্বামীজী আমায় সঙ্গে নিয়ে প্রসাদ পেতে গেলেন। আহার করতে করতে স্বামীজী বললেন, 'দেখ সিঙ্গি, concentrated food (সারভূত খাদ্য) খাওয়া চাই। কতকগুলো ভাত ঠেসে খাওয়া কেবল কুঁড়েমির গোড়া।' আবার কিছু পরেই বললেন, 'দেখ, জাপানীরা দিনে দু-বার তিনবার ভাত আর দালের ঝোল খায়। খুব জোয়ান লোকেরাও অতি অল্প খায়, বারে বেশী। আর যারা সঙ্গতিপন্ন, তারা মাংস প্রত্যহই খায়। আমাদের যে দু-বার আহার কুঁচকি-কণ্ঠা ঠেসে। একগাদা ভাত হজম করতে সব energy (শক্তি) চলে যায়।'

প্রশ্ন॥ আমাদের মাংস খাওয়াটা সকলের পক্ষে সুবিধা কি?

স্বামীজী॥ কেন, কম করে খাবে। প্রত্যহ এক পোয়া খেলেই খুব হয়। ব্যাপারটা কি জানিস?দরিদ্রতার প্রধান কারণ আলস্য। একজনের সাহেব রাগ করে মাইনে কমিয়ে দিলে; তা সে ছেলেদের দুধ কমিয়ে দিলে, একবেলা হয়তো মুড়ি খেয়ে কাটালে।

প্রশ্ন॥ তা নয়তো কি করবে?

স্বামীজী॥ কেন, আরও অধিক পরিশ্রম করে যাতে খাওয়া-দাওয়াটা বজায় থাকে, এটুকু করতে পারে না? পাড়ায় যে দু-ঘণ্টা আড্ডা দেওয়া চাই-ই-চাই। সময়ের কত অপব্যয় করে লোকে, তা আর কি বলব!

আহারান্তে স্বামীজী একটু বিশ্রাম করতে গেলেন।

* * *

একদিন স্বামীজী বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে আছেন, আমি তাঁকে দর্শন করতে গেছি। তাঁর সঙ্গে আমেরিকার ও জাপানের অনেক কথা হবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম–

প্রশ্ন॥ স্বামীজী, আমেরিকায় কতগুলি শিষ্য করেছ?

স্বামীজী॥ অনেক।

প্রশ্ন॥ ২।৪ হাজার?

স্বামীজী॥ ঢের বেশী।

প্রশ্ন॥ কি, সব মন্ত্রশিষ্য?

স্বামীজী॥ হাঁ।

প্রশ্ন॥ কি মন্ত্র দিলে, স্বামীজী? সব প্রণবযুক্ত মন্ত্র দিয়েছ?

স্বামীজী॥ সকলকে প্রণবযুক্ত দিয়েছি।

প্রশ্ন॥ লোকে বলে শূদ্রের প্রণবে অধিকার নেই, তায় তারা ম্লেচ্ছ; তাদের প্রণব কেমন করে দিলে? প্রণব তো ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কারও উচ্চারণে অধিকার নেই?

স্বামীজী॥ যাদের মন্ত্র দিয়েছি, তারা যে ব্রাহ্মণ নয়, তা তুই কেমন করে জানলি?

প্রশ্ন॥ ভারত ছাড়া সব তো যবন ও ম্লেচ্ছের দেশ; তাদের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ কোথায়? স্বামীজী॥ আমি যাকে যাকে মন্ত্র দিয়েছি, তারা সকলেই ব্রাহ্মণ। ও-কথা ঠিক, ব্রাহ্মণ নইলে প্রণবের অধিকারী হয় না। ব্রাহ্মণের ছেলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, তার মানে নেই; হবার খুব সম্ভাবনা, কিন্তু না হতেও পারে। বাগবাজারে—চক্রবর্তীর ভাইপো যে মেথর হয়েছে, মাথায় করে গুয়ের হাঁড়ি নে যায়! সেও তো বামুনের ছেলে।

প্রশ্ন॥ ভাই, তুমি আমেরিকা-ইংলণ্ডে ব্রাহ্মণ কোথায় পেলে?

স্বামীজী॥ ব্রাহ্মণজাতি আর ব্রাহ্মণের গুণ—দুটো আলাদা জিনিষ। এখানে সব—জাতিতে ব্রাহ্মণ, সেখানে গুণে। যেমন সত্ত্ব রজঃ তমঃ—তিনটি গুণ আছে জানিস, তেমনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বলে গণ্য হবার গুণও আছে। এই তোদের দেশে ক্ষত্রিয়-গুণটা যেমন প্রায় লোপ পেয়ে গেছে, তেমনি ব্রাহ্মণ-গুণটাও প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। ওদেশে এখন সব ক্ষত্রিয়ত্ব থেকে ব্রাহ্মণত্ব পাচ্ছে।

প্রশ্ন॥ তার মানে সেখানকার সাত্ত্বিকভাবের লোকদের তুমি ব্রাহ্মণ বলছ?

স্বামীজী॥ তাই বটে; সত্ত্ব রজঃ তমঃ যেমন সকলের মধ্যে আছে—কোনটা কাহার মধ্যে কম, কোনটা কাহারও মধ্যে বেশী; তেমনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হবার কয়টা গুণও সকলের মধ্যে আছে। তবে এই কয়টা গুণ সময়ে সময়ে কম বেশী হয়। আর সময়ে সময়ে এক একটা প্রকাশ হয়। একটা লোক যখন চাকরি করে, তখন সে শূদ্রত্ব পায়।

যখন দু-পয়সা রোজগারের ফিকিরে থাকে, তখন বৈশ্য; আর যখন মারামারি ইত্যাদি করে, তখন তার ভিতর ক্ষত্রিয়ত্ব প্রকাশ পায়। আর যখন সে ভগবানের চিন্তায় বা ভগবৎ-প্রসঙ্গে থাকে, তখন সে ব্রাহ্মণ। এক জাতি থেকে আর এক জাতি হয়ে যাওয়াও স্বাভাবিক। বিশ্বামিত্র আর পরশুরাম—একজন ব্রাহ্মণ ও অপর ক্ষত্রিয় কেমন করে হল?

প্রশ্ন॥ এ কথা তো খুব ঠিক বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আমাদের দেশে অধ্যাপক আর কুলগুরু মহাশয়েরা সে-রকম ভাবে দীক্ষাশিক্ষা কেন দেন না? স্বামীজী॥ ঐটি তোদের দেশের একটি বিষম রোগ। যাক। সে-দেশে যারা ধর্ম করতে শুরু করে, তারা কেমন নিষ্ঠা করে জপ-তপ, সাধন-ভজন করে। প্রশ্ন॥ তাদের আধ্যাত্মিক শক্তিও অতি শীঘ্র প্রকাশ পায় শুনতে পাই। শরৎ মহারাজের একজন (পাশ্চাত্য) শিষ্য মোট চার মাস সাধন-ভজন করে তার যে-সকল ক্ষমতা হয়েছে, তা লিখে পাঠিয়েছে, সেদিন শরৎ মহারাজ দেখালেন।

স্বামীজী॥ হাঁ, তবে বোঝ তারা ব্রাহ্মণ কিনা—তোদের দেশে যে মহা অত্যাচারে সমস্ত যাবার উপক্রম হয়েছে। গুরুঠাকুর মন্ত্র দেন, সেটা তার একটা ব্যবসা। আর গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধটাও কেমন! ঠাকুর-মহাশয়ের ঘরে চাল নেই। গিন্নি বললেন, 'ওগো, একবার শিষ্যবাড়ী-টাড়ী যাও; পাশা খেললে কি আর পেট চলে?' ব্রাহ্মণ বললেন, 'হাঁগো, কাল মনে করে দিও, অমুকের বেশ সময় হয়েছে শুনছি, আর তার কাছে অনেক দিন যাওয়াও হয়নি।' এই তো তোদের বাঙলার গুরু! পাশ্চাত্যে আজও এ-রকমটা হয়নি। সেখানে অনেকটা ভাল আছে।

* * *

প্রতি বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবের দিন এক অপরূপ দৃশ্য হয়। বঙ্গদেশে এটি যে একটি সুবৃহৎ মেলা, তার আর সন্দেহ নাই। এখানে দশ-বিশ হাজার লোক একত্র হইলেও সে-প্রকার ঠেলাঠেলি হয় না, কারণ অধিকাংশই শিক্ষিত ভদ্রসন্তান। কিন্তু এখানেও এক সময়ে এই ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব পরিলক্ষিত হয়। ষ্টীমার আসিয়া মঠের কিনারায়

লাগিল, আর রক্ষা নাই—সকলকেই আগে নামিতে হইবে। মঠ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে ষ্টীমারে উঠিবার সময়ও ঠিক তদ্রূপ—কে কার ঘাড়ে পড়ে তার ঠিক নাই।

স্বামীজীর সঙ্গে একদিন মঠে তাঁহার এক বন্ধুর আমাদের জাতির এই অসংযত ভাবের বিষয়ে কথাবার্তা হয়। তিনি দুঃখ প্রকাশপূর্বক বলিয়াছিলেন, 'দেখ, আমাদের একটা সেকেলে কথা আছে—যদি না পড়ে পো, সভায় নিয়ে থো। কথাটি খুব পুরাতন। আর সভা মানে সামাজিক এক-আধটা সভা—যা কালেভদ্রে কারও বাড়ীতে হয়, তা নয়; সভা হচ্ছে রাজদরবার। আগে আমাদের যে-সকল স্বাধীন বাঙালী রাজা ছিল, তাদের প্রত্যহই সকালে বৈকালে সভা বসত। সকালে সমস্ত রাজকার্য। আর খবরের কাগজ তো ছিল না, সমস্ত মাতব্বর ভদ্রলোকের কাছে রাজ্যের প্রায় সব খবর লওয়া হত, আর তাতে সেই রাজধানীর সব ভদ্রলোক আসত। যদি কেউ না আসত তার খবর হত। এইসকল দরবার-সভাই আমাদের দেশের—কি সব সভ্য দেশের সভ্যতার centre (কেন্দ্র) ছিল। পশ্চিমে রাজপুতানায় আমাদের এখানকার চেয়ে ঢের ভাল। সেখানে আজও সেই রকমটা কতক হয়।'

প্রশ্ন॥ এখন দেশী রাজা আমাদের দেশে নেই বলে কি দেশের লোকগুলো এতই অসভ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে?

স্বামীজী॥ এগুলো একটা অবনতি—যার মূলে স্বার্থপরতা, এ তারই লক্ষণ। জাহাজে ওঠবার সময় 'চাচা আপন বাঁচা', আর গানের সময় 'হামবড়া'—এই হচ্ছে সব ভিতরের ভাব, একটু self-sacrifice (আত্মত্যাগ) শিক্ষা করলেই ঐটুকু যায়। এটা বাপ-মার দোষ—ঠিক ঠিক সৌজন্যও শেখায় না। সভ্যতা self- sacrifice-এর গোড়া।

স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ বাপ-মার অন্যায় দাবের জন্য ছেলেগুলো যে একটা স্ফূর্তি পায় না। 'গান গাওয়াটা বড় দোষ'—ছেলের কিন্তু একটা ভাল গান শুনলে প্রাণ ছটফট করে, সে নিজের গলায় কেমন করে সেটি বার করবে। কাজেই সে একটা আড্ডা খোঁজে। 'তামাক খাওয়াটা মহাপাপ'—এখন কাজেই সে চাকর-বাকরের সঙ্গে আড্ডা দেবে না তো

কি করবে? সকলেরই ভেতর সেই infinite (অনন্ত) ভাব আছে—সে-সব ভাবের কোন-রকম স্ফূর্তি চাই। তোদের দেশে তা হবার যো নাই। তা হতে গেলে বাপ-মাদেরও নূতন করে শিক্ষা দিতে হবে। এই তো অবস্থা! সুসভ্য নয়, তার ওপর আবার তোদের শিক্ষিত বড় বড় বাবুরা চান কিনা—এখনি রাজ্যিটা ইংরেজ তাঁদের হাতে ফেলে দেয়, আর তাঁরা রাজ্যিটা চালান। দুঃখুও হয়, হাসিও পায়। আরে সে martial (সামরিক) ভাব কই? তার গোড়ায় যে দাসভাব (দাস্যভাব) সাধন করা চাই, নির্ভর চাই—হামবড়াটা martial ভাব নয়। হুকুমে এগিয়ে মাথা দিতে হবে—তবে না মাথা নিতে পারবে। সে যে আপনাকে আগে বলি দিতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোন ভক্ত-লেখক—তাঁহার কোন পুস্তকে যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন, স্বামীজী তাঁহাকে ডাকাইয়া উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেনঃ

তোর এমন করে সকলকে গাল দিয়ে লেখবার কি দরকার ছিল? তোর ঠাকুরকে তারা বিশ্বাস করে না, তা কি হয়েছে? আমরা কি একটা দল করেছি না কি? আমরা কি রামকৃষ্ণ-ভজা যে, তাঁকে যে না ভজবে সে আমাদের শত্রু? তুই তো তাঁকে নীচু করে ফেললি, তাঁকে ছোট করে ফেললি। তোর ঠাকুর যদি ভগবান্ হন তো যে যেমন করে ডাকুক, তাঁকেই তো ডাকছে। তবে সবাইকে গাল দেবার তুই কে? না, গাল দিলেই তোর কথা তারা শুনবে? আহাম্মক! মাথা দিতে পারিস তবে মাথা নিতে পারবি; নইলে তোর কথা লোকে নেবে কেন?

একটু স্থির হইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেনঃ

বীর না হলে কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে, না নির্ভর করতে পারে? বীর না হলে হিংসা দ্বেষ যায় না; তা সভ্য হবে কি? সেই manly (পুরুষোচিত) শক্তি, সেই বীরভাব তোদের দেশে কই? নেই, নেই। সে-ভাব ঢের খুঁজে দেখেছি, একটা বৈ দুটো দেখতে পাইনি।

প্রশ্ন॥ কার দেখেছ, স্বামীজী?

স্বামীজী॥ এক G. C-র (গিরিশচন্দ্রের) দেখেছি যথার্থ নির্ভর, ঠিক দাসভাব; মাথা দিতে প্রস্তুত, তাই না ঠাকুর তার আমমোক্তারনামা নিয়েছিলেন। কি নির্ভর! এমন আর দেখলুম না; নির্ভর তার কাছে শিখেছি।

এই বলিয়া স্বামীজী হাত তুলিয়া গিরিশবাবুর উদ্দেশে নমস্কার করিলেন।

* * *

দ্বিতীয়বার মার্কিন যাইবার সমস্ত উদ্যোগ হইতেছে, স্বামীজী অনেকটা ভাল আছেন। একদিন প্রাতে তিনি কলিকাতায় কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া বাগবাজারে বলরাম বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন নৌকা ডাকিতে গিয়াছে—স্বামীজী এখনি মঠে যাইবেন। ইতোমধ্যে বন্ধুকে ডাকাইয়া বলিলেনঃ চল, মঠে যাবি আমার সঙ্গে—অনেক কথা আছে।

বন্ধুটি উপবেশন করিলে পর আবার বলিলেন, 'আজ মজা হয়েছে। একজনের বাড়ী গেছলুম—সে একটা ছবি আঁকিয়াছে—কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ। কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে রথের উপর, ঘোড়ার লাগাম হাতে আর অর্জুনকে গীতা বলছেন। ছবিটা দেখিয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয়েছে? আমি বললুম, মন্দ কি! সে জিদ করে বললে, সব দোষগুণ বিচার করে বল—কেমন হয়েছে। কাজেই বলতে হল—কিছুই হয়নি। প্রথমতঃ 'রথটা' আজকালের প্যাগোডা রথ নয়, তারপর কৃষ্ণের ভাব কিছুই হয়নি।'

প্রশ্ন॥ কেন প্যাগোডা রথ নয়?

স্বামীজী॥ ওরে দেশে যে বুদ্ধদেবের পর থেকে সব খিচুড়ি হয়ে গেছে। প্যাগোডা রথে চড়ে রাজারা যুদ্ধ করত না! রাজপুতানায় আজও রথ আছে, অনেকটা সেই সেকেলে রথের মত। Grecian mythology-র (গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর) ছবিতে যে-সব রথ আঁকা আছে, দেখেছিস? দু-চাকার, পিছন দিয়ে ওঠা-নাবা যায়—সেই রথ আমাদের ছিল। একটা ছবি আঁকলেই কি হল? সেই সময়ে সমস্ত যেমন ছিল, তার অনুসন্ধানটা নিয়ে

সময়ের জিনিষগুলো দিলে তবে ছবি দাঁড়ায়। Truth represent (প্রতীকে সত্যকে প্রকাশ) করা চাই, নইলে কিছুই হয় না, যত মায়ে-খেদান বাপে-তাড়ান ছেলে—যাদের স্কুলে লেখাপড়া হল না, আমাদের দেশে তারাই যায় painting (চিত্রবিদ্যা) শিখতে। তাদের দ্বারা কি আর কোন ছবি হয়? একখানা ছবি এঁকে দাঁড় করান আর একখানা perfect drama (সর্বাঙ্গসুন্দর নাটক) লেখা, একই কথা।

প্রশ্ন॥ কৃষ্ণকে কি ভাবে আঁকা উচিত ওখানে?

স্বামীজী॥ শ্রীকৃষ্ণ কেমন জানিস?—সমস্ত গীতাটা personified (মূর্তিমান্)! যখন অর্জুনের মোহ আর কাপুরুষতা এসেছে, তিনি তাকে গীতা বলছেন, তখন তাঁর central idea (মুখ্যভাব)-টি তার শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে।

এই বলিয়া স্বামীজী শ্রীকৃষ্ণকে যেভাব আঁকা কর্তব্য, সেইমত নিজে অবস্থিত হইয়া দেখাইলেন আর বলিলেনঃ

এমনি করে সজোরে ঘোড়া দুটোর রাশ টেনে ফেলেছেন যে, ঘোড়ার পিছনের পা-দুটো প্রায় হাঁটুগাড়া গোছ আর সামনের পাগুলো শূন্যে উঠে পড়েছে—ঘোড়াগুলো হাঁ করে ফেলেছে। এতে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে একটা বেজায় action (ক্রিয়া) খেলছে। তাঁর সখা ত্রিভুবনবিখ্যাত বীর; দু-পক্ষ সেনাদলের মাঝখানে ধনুক-বাণ ফেলে দিয়ে কাপুরুষের মত রথের ওপর বসে পড়েছেন। আর শ্রীকৃষ্ণ সেই-রকম ঘোড়ার রাশ টেনে চাবুক হাতে সমস্ত শরীরটিকে বেঁকিয়ে তাঁর সেই অমানুষী প্রেমকরুণামাখা বালকের মত মুখখানি অর্জুনের দিকে ফিরিয়ে স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে তাঁর প্রাণের সখাকে গীতা বলছেন। এখন গীতার preacher (প্রচারক)-এর এ ছবি দেখে কি বুঝলি?

উত্তর॥ ক্রিয়াও চাই আর গাম্ভীর্য-স্থৈর্যও চাই।

স্বামীজী॥ অ্যাই!—সমস্ত শরীরে intense action (তীব্র ক্রিয়াশীলতা) আর মুখ যেন নীল আকাশের মত ধীর গম্ভীর প্রশান্ত! এই হল গীতার central idea (মুখ্যভাব); দেহ, জীবন আর প্রাণ মন তাঁর শ্রীপদে রেখে সকল অবস্থাতেই স্থির গম্ভীর।

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥১৬

যিনি কর্ম করেও তার মধ্যে চিত্তকে প্রশান্ত রাখতে পারেন, আর বাহ্য কোন কর্ম না করলেও অন্তরে যার আত্মচিন্তারূপ কর্মের প্রবাহ চলতে থাকে, তিনিই মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনিই যোগী, তাঁরই সব কর্ম করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে যিনি নৌকা ডাকিতে গিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া সংবাদ দিলেন যে নৌকা আসিয়াছে। স্বামীজী যে বন্ধুর সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন, তাঁহাকে বলিলেন, 'চল, মঠে যাই। বাড়ীতে বলে এসেছিস তো?'

বন্ধু॥ আজ্ঞা হাঁ।

সকলে কথা কহিতে কহিতে মঠে যাইবার জন্য নৌকায় উঠিলেন।

স্বামীজী॥ এই ভাব সমস্ত লোকের ভেতর ছড়ান চাই—কর্ম কর্ম অনন্ত কর্ম—তার ফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে, আর প্রাণ-মন সেই রাঙা পায়।

বন্ধু॥ এ তো কর্মযোগ!

স্বামীজী॥ হাঁ, এই কর্মযোগ। কিন্তু সাধন-ভজন না করলে কর্মযোগও হবে না। চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য চাই। নইলে প্রাণ-মন কেমন করে তাঁতে দিয়ে রাখবি?

বন্ধু॥ গীতার কর্ম মানে তো লোকে বলে—বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান, সাধন-ভজন; আর তা ছাড়া সব কর্ম অকর্ম।

স্বামীজী॥ খুব ভাল কথা, ঠিক কথা; কিন্তু সেটাকে আরও বাড়িয়ে নে না। তোর প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, প্রতি চিন্তার জন্য, তোর প্রতি কাজের জন্য দায়ী কে? তুই তো?

বন্ধু॥ তা বটে, নাও বটে। ঠিক বুঝতে পারছিনি। আসল কথা তো দেখছি গীতার ভাব– 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন' ইত্যাদি। তা আমি তাঁর শক্তিতে চালিত, তবে আর আমার কাজের জন্য আমি তো একেবারেই দায়ী নই।

স্বামীজী॥ ওটা বড় উচ্চ অবস্থার কথা। কর্ম করে চিত্ত শুদ্ধ হলে পর যখন দেখতে পাবি– তিনিই সব করাচ্ছেন, তখন ওটা বলা ঠিক; নইলে সব মুখস্থ–মিছে।

বন্ধু॥ মিছে কেন, যদি একজন ঠিক বিচার করে বোঝে যে, তিনিই সব করাচ্ছেন।

স্বামীজী॥ বিচার করে দেখলে পরে তখন। তা সে যখনকার তখনি। তারপর তো নয়। কি জানিস, বেশ বুঝে দেখ–অহঃরহঃ তুই যা-ই করিস, তুই করছিস মনে করে করিস কিনা? তিনিই করাচ্ছেন, কতক্ষণ মনে থাকে? তবে ঐ-রকম বিচার করতে করতে এমন একটা অবস্থা আসবে যে, 'আমি'টা চলে যাবে আর তার জায়গায় 'হৃষীকেশ' এসে বসবেন। তখন 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন' বলা ঠিক হবে। আর বাবা, 'আমি'টা বুক জুড়ে বসে থাকলে তাঁর আসবার জায়গা কোথায় যে তিনি আসবেন? তখন হৃষীকেশের অস্তিত্বই নেই!

বন্ধু॥ কুকর্মের প্রবৃত্তিটা তিনিই দিচ্ছেন তো?

স্বামীজী॥ না রে না; ও-রকম ভাবলে ভগবানকে অপরাধী করা হয়। তিনি কুকর্মের প্রবৃত্তি দিচ্ছেন না; ওটা তোর আত্মতৃপ্তির বাসনা থেকেই ওঠে। জোর করে তিনি সব করাচ্ছেন বলে অসৎ কাজ করলে সর্বনাশ হয়। ঐ থেকেই ভাবের ঘরে চুরি আরম্ভ হয়। ভাল কাজ করলে কেমন একটা elation (উল্লাস) হয়। বুক ফুলে ওঠে। বেশ করেছি বলে আপনাকে বাহবা দিবি। এটা তো আর এড়াবার যো নেই, দিতেই হবে। ভাল কাজটার বেলা আমি, আর মন্দ কাজটার সময় তিনি–ওটা গীতা-বেদান্তের বদহজম, বড় সর্বনেশে কথা, অমন

কথা বলিসনি। বরং তিনি ভালটা করাচ্ছেন আর আমি মন্দটা করছি–বল। তাতে ভক্তি আসবে, বিশ্বাস আসবে। তাঁর কৃপা হাতে হাতে দেখতে পাবি। আসল কথা, কেউ তোকে সৃষ্টি করেনি, তুই আপনাকে আপনি সৃষ্টি করেছিস কিনা। বিচার এই, বেদান্ত এই। তবে সেটা উপলব্ধি নইলে বোঝা যায় না। সেইজন্য প্রথমটা সাধককে দ্বৈতভাবটা ধরে নিয়ে চলতে হয়; তিনি ভালটা করান, আমি মন্দটা করি–এটিই হল চিত্তশুদ্ধির সহজ উপায়। তাই বৈষ্ণবদের ভেতর দ্বৈতভাব এত প্রবল। অদ্বৈতভাব গোড়ায় আনা বড় শক্ত। কিন্তু ঐ দ্বৈতভাব থেকে পরে অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি হয়।

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেনঃ

দেখ, বিটলেমোটা বড় খারাপ। ভাবের ঘরে চুরি যদি না থাকে, অর্থাৎ যদি প্রবৃত্তিটা বড়ই নীচ হয় অথচ যদি সত্যই তার মনে বিশ্বাস হয় যে, এও ভগবান্ করাচ্ছেন, তাহলে কি আর বেশীদিন তাকে সেই নীচ কাজ করতে হয়? সব ময়লা চট করে সাফ হয়ে যায়। আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা খুব বুঝত; আর আমার মনে হয়–বৌদ্ধধর্মের যখন পতন আরম্ভ হল, আর বৌদ্ধদের পীড়নে লোকেরা লুকিয়ে লুকিয়ে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত, বাবা, দু-মাস ধরে আর যাগ করবার যো-টি নেই, একরাত্রেই কাঁচা মাটির মূর্তি গড়ে পূজা শেষ করে তাকে বিসর্জন দিতে হবে, যেন এতটুকু চিহ্ন না থাকে–সেই সময়টা থেকে তন্ত্রের উৎপত্তি হল। মানুষ একটা concrete (স্থূল) চায়, নইলে প্রাণটা বুঝবে কেন? ঘরে ঘরে ঐ এক রাত্রে যজ্ঞ হতে আরম্ভ হল। কিন্তু প্রবৃত্তি সব sensual (ইন্দ্রিয়গত) হয়ে পড়েছে। ঠাকুর যেমন বলেছিলেন, 'কেউ কেউ নর্মদা দিয়ে পথ করে'; তেমনি সদগুরুরা দেখলেন যে, যাদের প্রবৃত্তি নীচ বলে কোন সৎ কাজের অনুষ্ঠান করতে পারছে না, তাদেরও ধর্মপথে ক্রমশঃ নিয়ে যাওয়া দরকার। তাঁদের জন্যই ঐ-সব বিটকেল তান্ত্রিক সাধনার সৃষ্টি হয়ে পড়ল।

প্রশ্ন॥ মন্দ কাজের অনুষ্ঠান তো সে ভাল বলে করতে লাগল, এতে তার প্রবৃত্তির নীচতা কেমন করে যাবে?

স্বামীজী॥ ঐ যে প্রবৃত্তির মোড় ফিরিয়ে দিলে—ভগবান্ পাবে বলে কাজ করছে।

প্রশ্ন॥ সত্য-সত্যই কি তা হয়?

স্বামীজী॥ সেই একই কথা; উদ্দেশ্য ঠিক থাকলেই হবে, না হবে কেন?

প্রশ্ন। পঞ্চ 'মকার'-সাধনে কিন্তু অনেকের মন যে মদমাংসে পড়ে যায়?

স্বামীজী॥ তাই পরমহংস-মশাই এসেছিলেন। ও-ভাবে তন্ত্রসাধনের দিন গেছে। তিনিও তন্ত্রসাধন করেছিলেন, কিন্তু ও-রকম ভাবে নয়। মদ খাবার বিধি যেখানে, তিনি একটা কারণের ফোঁটা কাটতেন। তন্ত্রটা বড় slippery ground (পিছল পথ)। এই জন্য বলি, এদেশে তন্ত্রের চর্চা চূড়ান্ত হয়েছে। এখন আরও উপরে যাওয়া চাই। বেদের [বেদান্তের] চর্চা চাই। চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য করে সাধন করা চাই, অখণ্ড ব্রহ্মচর্য চাই।

প্রশ্ন॥ চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য কি রকম?

স্বামীজী॥ জ্ঞান-বিচার বৈরাগ্য, ভক্তি, কর্ম আর সঙ্গে সঙ্গে সাধনা, এবং স্ত্রীলোকের প্রতি পূজাভাব চাই।

প্রশ্ন॥ স্ত্রীলোকের প্রতি এইভাব কি করে আসে?

স্বামীজী॥ ওরাই হল আদ্যাশক্তি। যেদিন আদ্যাশক্তির পুজো আরম্ভ হবে, যেদিন মায়ের কাছে প্রত্যেক লোক আপনাকে আপনি 'নরবলি' দেবে, সেই দিনই ভারতের যথার্থ মঙ্গল শুরু হবে।

এই কথা বলিয়া স্বামীজী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

একদিন তাঁহার কতকগুলি বাল্যবন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিলেনঃ স্বামীজী, তুমি যে ছেলেবেলায় বে করতে বললে বলতে, 'বে করব না, আমি কি হব দেখবি।' তা যা বলেছিলে, তাই করলে।

স্বামীজী॥ হাঁ ভাই, করেছি বটে। তোরা তো দেখেছিস—খেতে পাইনি, তার উপর খাটুনি। বাপ, কতই না খেটেছি! আজ আমেরিকানরা ভালবেসে এই দেখ কেমন খাট বিছানা গদি দিয়েছে! দুটো খেতেও পাচ্ছি। কিন্তু ভাই, ভোগ আমার অদৃষ্টে নেই। গদিতে শুলেই রোগ বাড়ে, হাঁপিয়ে মরি। আবার মেজেয় এসে পড়ি, তবে বাঁচি।

রক্ত-মাংসের শরীর, কতই বা সহ্য হবে? এই দারুণ পরিশ্রমের ফলে স্বামীজীর অকালে দেহত্যাগ হয়।

৫. তিনদিনের স্মৃতিলিপি

তিনদিনের স্মৃতিলিপি

২২ জানুআরী, ১৮৯৮ খ্রীঃ। ১০ মাঘ শনিবার। সকালে উঠিয়াই হাতমুখ ধুইয়া বাগবাজার ৫৭নং রামকান্ত বসুর স্ট্রীটস্থ বলরাম বাবুর বাটীতে স্বামীজীর কাছে উপস্থিত হইয়াছি। একঘর লোক। স্বামীজী বলিতেছেনঃ চাই শ্রদ্ধা, নিজেদের ওপর বিশ্বাস চাই। Strength is life, weakness is death (সবলতাই জীবন, দুর্বলতা মৃত্যু)। আমরা আত্মা, অমর, মুক্ত—pure, pure by nature (পবিত্র, স্বভাবতঃ পবিত্র)। আমরা কি কখনও পাপ করতে পারি?অসম্ভব। এই রকম বিশ্বাস চাই। এই বিশ্বাসই আমাদের মানুষ করে, দেবতা করে তোলে। এই শ্রদ্ধার ভাবটা হারিয়েই তো দেশটা উৎসন্ন গিয়েছে।

প্রশ্ন॥ এই শ্রদ্ধাটা আমাদের কেমন করে নষ্ট হল?

স্বামীজী॥ ছেলেবেলা থেকে আমরা negative education (নেতিমূলক শিক্ষা) পেয়ে আসছি। আমরা কিছু নই—এ শিক্ষাই পেয়ে এসেছি। আমাদের দেশে যে বড়লোক কখনও জন্মেছে, তা আমরা জানতেই পাই না। Positive (ইতিমূলক) কিছু শেখান হয়নি। হাত-পায়ের ব্যবহার তো জানিইনি। ইংরেজদের সাতগুষ্টির খবর জানি, নিজের বাপ-দাদার খবর রাখি না। শিখেছি কেবল দুর্বলতা। জেনেছি যে আমরা বিজিত দুর্বল, আমাদের কোন বিষয়ে স্বাধীনতা নেই। এতে আর শ্রদ্ধা নষ্ট হবে না কেন? দেশে এই শ্রদ্ধার ভাবটা আবার আনতে হবে। নিজেদের উপর বিশ্বাসটা আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। তা হলেই দেশের যত কিছু problems (সমস্যাগুলি) ক্রমশঃ আপনা-আপনিই solved (মীমাংসিত) হয়ে যাবে।

প্রশ্ন॥ সব দোষ শুধরে যাবে, তাও কি কখনও হয়? সমাজে কত অসংখ্য দোষ রয়েছে! দেশে কত অভাব রয়েছে, যা পূরণ করবার জন্য কংগ্রেস প্রভৃতি অন্যান্য দেশহিতৈষী দল

কত আন্দোলন করছে, ইংরেজ বাহাদুরের কাছে কত প্রার্থনা করছে! এ-সব অভাব কিসে পূরণ হবে?

স্বামীজী॥ অভাবটা কার? রাজা পূরণ করবে, না তোমরা পূরণ করবে?

প্রশ্ন॥ রাজাই অভাব পূরণ করবেন। রাজা না দিলে আমরা কোথা থেকে কি পাব, কেমন করে পাব?

স্বামীজী॥ ভিখিরীর অভাব কখনও পূর্ণ হয় না। রাজা অভাব পূরণ করলে সব রাখতে পারবে, সে লোক কই? আগে মানুষ তৈরী কর। মানুষ চাই। আর শ্রদ্ধা না আসলে মানুষ কি করে হবে?

প্রশ্ন॥ মহাশয়, majority-র (অধিকাংশের) কিন্তু এ মত নয়।

স্বামীজী॥ Majority (অধিকাংশ) তো fools (নির্বোধ), men of common intellect (সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন); মাথাওয়ালা লোক অল্প। এই মাথাওয়ালা লোকেরাই সব কাজের সব department-এরই (বিভাগেরই) নেতা। এদেরই ইঙ্গিতে majority (অধিকাংশ) চলে। এদেরই আদর্শ করে চললে কাজও সব ঠিক হয়। আহাম্মকেরাই শুধু হামবড়া হয়ে চলে, আর মরে। সমাজ-সংস্কার আর কি করবে? তোমাদের সমাজ-সংস্কার মানে তো বিধবার বিয়ে আর স্ত্রী-স্বাধীনতা বা ঐ রকম আর কিছু। তোমাদের দুই-এক বর্ণের সংস্কারের কথা বলছ তো? দুই-চার জনের সংস্কার হল, তাতে সমস্ত জাতটার কি এসে যায়? এটা সংস্কার না স্বার্থপরতা? নিজেদের ঘরটা পরিষ্কার হল, আর যারা মরে মরুক।

প্রশ্ন॥ তা হলে কি কোন সমাজ-সংস্কারের দরকার নেই বলেন?

স্বামীজী॥ দরকার আছে বৈকি। আমি তা বলছি না। তোমাদের মুখে যা সংস্কারের কথা শুনতে পাই, তার মধ্যে অনেকগুলোই অধিকাংশ গরীব সাধারণদের স্পর্শ করবে না। তোমরা যা চাও, তা তাদের আছে। এজন্য তারা ওগুলোকে সংস্কার বলেই মনে করবে না। আমার কথা এই যে, শ্রদ্ধার অভাবই আমাদের মধ্যে সমস্ত evils (অনর্থ) এনেছে ও আরও আনছে। আমার চিকিৎসা হচ্ছে রোগের কারণকে নির্মূল করা—রোগ চাপা দিয়ে

রাখা নয়। সংস্কার আর দরকার নেই? যেমন ভারতবর্ষে inter-marriage (অন্তর্বিবাহ)-টা হওয়া দরকার, তা না হওয়ায় জাতটার শারীরিক দুর্বলতা এসেছে।

* * *

২৩ জানুআরী, ১৮৯৮; ১১ মাঘ, রবিবার। বাগবাজারে বলরামবাবুর বাটীতে সন্ধ্যার পর আজ সভা হইয়াছে। স্বামীজী উপস্থিত আছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ প্রভৃতি অনেকেই আসিয়াছেন। স্বামীজী পূর্বদিকের বারান্দায় বসিয়া আছেন। বারান্দাটি লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। দক্ষিণ ও উত্তর দিকের বারান্দাও সেইরূপ লোকে পরিপূর্ণ। স্বামীজী কলিকাতায় থাকিলে নিত্যই এইরূপ হইত। স্বামীজী সুন্দর গান গাহিতে পারেন, অনেকে শুনিয়াছেন। অধিকাংশ লোকের গান শুনিবার ইচ্ছা দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় ফিস্ ফিস্ করিয়া দুই-এক জনকে স্বামীজীর গান শুনিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছেন। স্বামীজী নিকটেই ছিলেন, মাষ্টার মহাশয়ের কাণ্ড দেখিতে পাইলেন।

স্বামীজী॥ কি বলছ মাষ্টার, বল না? ফিস্ ফিস্ করছ কেন?

মাষ্টার মহাশয়ের অনুরোধক্রমে অতঃপর স্বামীজী ‘যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে’ গানটি ধরিলেন। যেন বীণার ঝঙ্কার উঠিতে লাগিল। যাঁহারা তখনও আসিতেছিলেন, তাঁহারা সিঁড়ি হইতে মনে করিলেন—যেন গানটি বেহালার সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গীত হইতেছে। গান শেষ হইলে স্বামীজী মাষ্টার মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ‘হয়েছে তো? আর গান না। নেশা ধরে যাবে। আর গালটা লেকচার দিয়ে দিয়ে মোটা হয়ে গেছে। Voice (গলার স্বর)-টা roll করে (কাঁপে)।’

অতঃপর স্বামীজী এক ব্রহ্মচারী শিষ্যকে ‘মুক্তির স্বরূপ’ সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলিলেন। ব্রহ্মচারীটি সভাস্থলে দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতান্তে শচীনবাবু ও আর দু-একজন বক্তৃতার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিলেন। স্বামীজী তাঁহার একজন গৃহীভক্তকে বলিলেন, ‘এর পক্ষে বা বিপক্ষে যদি কিছু বলবার থাকে তো বল।’ স্বামীজী উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে দুই- একজনকে মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলিলেন। দ্বৈত

ও অদ্বৈতের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক তর্ক হইল। তর্ক ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে দেখিয়া স্বামীজী ও তুরীয়ানন্দ স্বামী উভয়ে তর্ক-বিতর্ক থামাইয়া দিলেন।

স্বামীজী॥ রেগে উঠিল কেন? তোরা বড় গোল করিস। তিনি (পরমহংসদেব) বলতেন, 'শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি এক।' ভক্তিমতে ভগবানকে প্রেমময় বলা হয়। তাঁকে ভালবাসি—এ কথাও বলা যায় না, তিনি যে ভালবাসাময়। যে ভালবাসাটা হৃদয়ে আছে, তাই যে তিনি।এইরূপ যার যে-টান, সে সমস্তই তিনি। চোর চুরি করে, বেশ্যা বেশ্যাগিরি করে, মা ছেলেকে ভালবাসে—সব জায়গাতেই তিনি। একটা জগৎ আর একটাকে টানছে, সেখানেও তিনি। সর্বত্রই তিনি। জ্ঞানপক্ষেও সর্বস্থানে তাঁকে অনুভব হয়। এইখানেই জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য। যখন ভাবে ডুবে যায় অথবা সমাধি হয়, তখনই দ্বিভাব থাকতে পারে না—ভক্তের সহিত ভগবানের পৃথকত্ব থাকে না। ভক্তিশাস্ত্রে ভগবান্ লাভের জন্য পাঁচ ভাবে সাধনের কথা আছে, আর এক ভাবের সাধন তাতে যোগ করা যেতে পারে—ভগবানকে অভেদভাবে সাধন করা। ভক্তেরা অদ্বৈতবাদীদের 'অভেদবাদী ভক্ত' বলতে পারেন। মায়ার ভেতর যতক্ষণ, ততক্ষণ দ্বৈত থাকবেই। দেশ-কাল নিমিত্ত বা নাম-রূপই মায়া। যখন এই মায়ার পারে যাওয়া যায়, তখনই একত্ববোধ হয়; তখন মানুষ দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী থাকে না, তার কাছে তখন সব এক, এই বোধ হয়। জ্ঞানী ও ভক্তের তফাত কোথায় জানিস? একজন ভগবানকে বাইরে দেখে, আর একজন ভগবানকে ভেতরে দেখে। তবে ঠাকুর বলতেন, ভক্তির আর এক অবস্থাভেদ আছে, যাকে পরাভক্তি বলা যায়; মুক্তিলাভ করে অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থিত হয়ে তাঁকে ভক্তি করা। যদি বলা যায়—মুক্তিই যদি হয়ে গেল, তবে আবার ভক্তি করবে কেন? এর উত্তর এই—মুক্ত যে, তার পক্ষে কোন নিয়ম বা প্রশ্ন হতে পারে না। মুক্ত হয়েও কেউ কেউ ইচ্ছে করে ভক্তি রেখে দেয়।

প্রশ্ন॥ মশায়, এ তো বড় মুশকিলের কথা। চোরে চুরি করবে, বেশ্যা বেশ্যাগিরি করবে, সেখানেও ভগবান্; তা হলে ভগবানই তো সব পাপের জন্য দায়ী হলেন।

স্বামীজী॥ ঐ-রকম জ্ঞান একটা অবস্থার কথা। ভালবাসা-মাত্রকেই যখন ভগবান্ বলে বোধ হবে, তখনই কেবল ঐ রকম মনে হতে পারে। সেই রকম হওয়া চাই। ভাবটার realization (উপলব্ধি) হওয়া দরকার।

প্রশ্ন॥ তা হলে তো বলতে হবে, পাপেতেও তিনি।

স্বামীজী॥ পাপ আর পুণ্য বলে আলাদা জিনিষ তো কিছু নেই। ওগুলো ব্যবহারিক কথামাত্র। আমরা কোন জিনিষের এক-রকম ব্যবহারের নাম 'পাপ' ও আর এক-রকম ব্যবহারের নাম 'পুণ্য' দিয়ে থাকি। যেমন এই আলোটা জ্বলার দরুন আমরা দেখতে পাচ্ছি ও কত কাজ করছি, আলোর এই এক-রকম ব্যবহার। আবার এই আলোতে হাত দাও, হাত পুড়ে যাবে। এটা ঐ আলোর আর এক-রকম ব্যবহার। অতএব ব্যবহারেই জিনিষটা ভাল মন্দ হয়ে থাকে। পাপ-পুণ্যটাও ঐ-রকম। আমাদের শরীর ও মনের কোন শক্তিটার সুব্যবহারের নামই 'পুণ্য' এবং কুব্যবহার বা অপচয়ের নাম 'পাপ'।

প্রশ্নের উপর প্রশ্ন হইতে লাগিল। একজন বলিলেন, 'একটা জগৎ আর একটাকে টানে, সেখানেও ভগবান্—এ-কথা সত্য হোক আর না হোক, এর মধ্যে বেশ poetry (কবিত্ব) আছে।'

স্বামীজী॥ না হে বাপু, ওটা poetry (কবিত্ব) নয়। ওটা জ্ঞান হলে দেখতে পাওয়া যায়।

আবার Mill (মিল্) Hamilton (হ্যামিল্টন), Herbert Spencer (স্পেনসার) প্রভৃতির দর্শন লইয়া প্রশ্ন হইতে লাগিল। স্বামীজী সকলেরই যথাযথ উত্তর দিতে লাগিলেন। উত্তরে সকলেই মহা সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। অনেকে তাঁহার উত্তরদানে তৎপরতা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। শেষে আবার প্রশ্ন হইল।

প্রশ্ন॥ ব্যবহারিক প্রভেদই বা হয় কেন? কোন শক্তি মন্দরূপে ব্যবহার করতে লোকের প্রবৃত্তিই বা হয় কেন?

স্বামীজী॥ নিজের নিজের কর্ম অনুসারে প্রবৃত্তি হয়, সবই নিজের কর্মকৃত; সেইজন্যই প্রবৃত্তি দমন বা তাকে সুচারুরূপে চালনা করাও সম্পূর্ণ নিজের হাতে।

প্রশ্ন॥ সবই কর্মের ফল হলেও গোড়া তো একটা আছে! সেই গোড়াতেই বা আমাদের প্রবৃত্তির ভালমন্দ হয় কেন?

স্বামীজী॥ কে বললে গোড়া আছে? সৃষ্টি যে অনাদি। বেদের এই মত। ভগবান্ যতদিন আছেন, তাঁর সৃষ্টিও ততদিন আছে।

প্রশ্ন॥ আচ্ছা মায়াটা কেন এল? আর কোথা থেকে এল?

স্বামীজী॥ ভগবান্ সম্বন্ধে 'কেন' বলাটা ভুল। 'কেন' বলা যায় কার সম্বন্ধে?—যার অভাব আছে, তারই সম্বন্ধে। যার কোন অভাব নেই, যে পূর্ণ, তার পক্ষে আবার কেন কি? 'মায়া কোথা থেকে এল?'—এরূপ প্রশ্নও হতে পারে না। দেশ-কাল-নিমিত্তের নামই মায়া। তুমি আমি সকলেই এই মায়ার ভেতর। তুমি প্রশ্ন করছ ঐ মায়ার পারের জিনিষ সম্বন্ধে। মায়ার ভেতর থেকে মায়ার পারের জিনিষের কি কোন প্রশ্ন হতে পারে?

অতঃপর অন্য দুই-চারিটা কথার পর সভা ভঙ্গ হইল। আমরাও সকলে আপন আপন বাসায় ফিরিলাম।

* * *

২৪ জানুআরী, ১৮৯৮। ১২ মাঘ, সোমবার। গত শনিবার যে-লোকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন তিনি আবার আসিয়াছেন। তিনি intermarriage (অন্তর্বিবাহ) সম্বন্ধে আবার কথা পাড়িলেন। বলিলেন, 'ভিন্ন জাতির সহিত আমাদের কিরূপে আদান-প্রদান হতে পারে?'

স্বামীজী॥ বিধর্মী জাতিদের ভেতর আদান-প্রদান হবার কথা আমি বলি না। অন্ততঃ আপাততঃ তা সমাজ-বন্ধনকে শিথিল করে নানা উপদ্রবের কারণ হবে, এ কথা নিশ্চিত।

জান তো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নং' ইত্যাদি১৮; সমধর্মীদের মধ্যেই বিবাহ-প্রচলনের কথা আমি বলে থাকি।

প্রশ্ন॥ তা হলেও তো অনেক গোল। মনে করুন আমার এক মেয়ে আছে, সে এদেশে জন্মেছে ও পালিত হয়েছে। তার বিয়ে দিলুম এক পশ্চিমে লোকের সঙ্গে বা মান্দ্রাজীর সঙ্গে। বিয়ের পর মেয়ে জামাইয়ের কথা বোঝে না, জামাইও মেয়ের কথা বোঝে না। আবার পরস্পরের দৈনিক ব্যবহারাদিরও অনেক তফাত। বর-কনে সম্বন্ধে তো এই গণ্ডগোল; আবার সমাজেও মহা বিশৃঙ্খলা এসে পড়বে।

স্বামীজী॥ ও-রকম বিয়ে হতে আমাদের দেশে এখনও ঢের দেরী। একেবারে ও-রকম করাও ঠিক নয়। কাজের একটা secret (রহস্য) হচ্ছে—to go by the way of least possible resistance (যতদূর সম্ভব কম বাধার পথে চলা)। সেইজন্য প্রথমে এক বর্ণের মধ্যে বিয়ে চলুক। এই বাঙলা দেশের কায়স্থদের কথা ধর। এখানে কায়স্থদের মধ্যে অনেক শ্রেণী আছে—উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ ইত্যাদি। এদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত নেই। প্রথমে উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢ়ীতে বিবাহ হোক। যদি তা সম্ভব না হয়, বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীতে বিবাহ হোক। এইরূপে—যেটা আছে, সেটাকেই গড়তে হবে, ভাঙার নাম সংস্কার নয়।

প্রশ্ন॥ আচ্ছা না হয় বিয়েই হল, তাতে ফল কি? উপকার কি?

স্বামীজী॥ দেখতে পাচ্ছ না, আমাদের সমাজে এক এক শ্রেণীর মধ্যে একশ বছর ধরে বিয়ে হয়ে এখন ধরতে গেলে সব ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে হতে আরম্ভ হয়েছে। তাতেই শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে যত রোগও এসে জুটছে। অতি অল্পসংখ্যক লোকের ভেতরে চলাফেরা করেই রক্তটা দূষিত হয়ে পড়েছে। তাদের শরীরগত রোগাদি নবজাত সকল শিশুই নিয়ে জন্মাচ্ছে। সেইজন্য তাদের শরীরের রক্ত জন্মাবধি খারাপ। কাজেই কোন রোগের বীজকে resistকরবার (বাধা দেবার) ক্ষমতা ও-সব শরীরে বড় কম হয়ে পড়েছে। শরীরের মধ্যে একবার নূতন অন্যরকম রক্ত বিবাহের দ্বারা এসে পড়লে

এখনকার রোগাদির হাত থেকে ছেলেগুলো পরিত্রাণ পাবে এবং এখনকার চাইতে ঢের active (কর্মঠ) হবে।

প্রশ্ন॥ আচ্ছা মশায়, early marriage (বাল্যবিবাহ) সম্বন্ধে আপনার মত কি?

স্বামীজী॥ বাঙলাদেশে শিক্ষিতদের মধ্যে ছেলেদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার নিয়মটা উঠে গিয়েছে। মেয়েদের মধ্যেও পূর্বের চেয়ে দু-এক বছর বড় করে বিয়ে দেওয়া আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু সেটা হয়েছে টাকার দায়ে। তা যেজন্যই হোক, মেয়েগুলোর আরও বড় করে বিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু বাপ-বেচারীরা কি করবে? মেয়ে বড় হলেই বাড়ীর গিন্নী থেকে আরম্ভ করে যত আত্মীয়রা ও পাড়ার মেয়েরা বে দেবার জন্য নাকে কান্না ধরবে। আর তোমাদের ধর্মধ্বজীদের কথা বলে আর কি হবে! তাদের কথা তো আর কেউ মানে না, তবুও তারা নিজেরাই মোড়ল সাজে। রাজা বললে যে, বার বছরের মেয়ের সহবাস করতে পারবে না, অমনি দেশের সব ধর্মধ্বজীরা 'ধর্ম গেল, ধর্ম গেল' বলে চীৎকার আরম্ভ করল। বার-তের বছরের বালিকার গর্ভ না হলে তাদের ধর্ম হবে না! রাজাও মনে করেন, বা রে এদের ধর্ম! এরাই আবার political agitation (রাজনীতিক আন্দোলন) করে, political right (রাষ্ট্রীয় অধিকার) চায়।

প্রশ্ন॥ তা হলে আপনার মত—মেয়ে-পুরুষ সকলেরই বেশী বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত।

স্বামীজী॥ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা চাই। তা না হলে অনাচার ব্যভিচার আরম্ভ হবে। তবে যে-রকম শিক্ষা চলেছে, সে-রকম নয়। Positive (ইতিমূলক) কিছু শেখা চাই। খালি বই-পড়া শিক্ষা হলে হবে না। যাতে character form (চরিত্র তৈরী) হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, এই-রকম শিক্ষা চাই।

প্রশ্ন॥ মেয়েদের মধ্যে অনেক সংস্কার দরকার।

স্বামীজী॥ ঐ-রকম শিক্ষা পেলে মেয়েদের problems (সমস্যাগুলো) মেয়েরা নিজেরাই solve (মীমাংসা) করবে। আমাদের মেয়েরা বরাবরই প্যানপেনে ভাবই শিক্ষা করে

আসছে। একটা কিছু হলে কেবল কাঁদতেই মজবুত। বীরত্বের ভাবটাও শেখা দরকার। এ সময়ে তাদের মধ্যে self-defence (আত্মরক্ষা) শেখা দরকার হয়ে পড়েছে। দেখ দেখি, ঝাঁসির রাণী কেমন ছিল!

প্রশ্ন॥ আপনি যা বলছেন, তা বড়ই নূতন ধরনের; আমাদের মেয়েদের মধ্যে সে-শিক্ষা দিতে এখনও সময় লাগবে।

স্বামীজী॥ চেষ্টা করতে হবে। তাদের শেখাতে হবে। নিজেদেরও শিখতে হবে। খালি বাপ হলেই তো হয় না, অনেক দায়িত্ব ঘারে করতে হয়। আমাদের মেয়েদের একটা শিক্ষা তো সহজেই দেওয়া যেতে পারে। হিন্দুর মেয়ে—সতীত্ব কি জিনিষ, তা সহজেই বুঝতে পারবে; এটা তাদের heritage (উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তি জিনিষ) কিনা। প্রথমে সেই ভাবটাই বেশ করে তাদের মধ্যে উস্কে দিয়ে তাদের character form (চরিত্র তৈরী) করতে হবে—যাতে তাদের বিবাহ হোক বা তারা কুমারী থাকুক, সকল অবস্থাতেই সতীত্বের জন্য প্রাণ দিতে কাতর না হয়। কোন একটা ভাবের জন্য প্রাণ দিতে পারাটা কি কম বীরত্ব? এখন যে-রকম সময় পড়েছে, তাতে তাদের ঐ যে ভাবটা বহুকাল থেকে আছে, তার বলেই তাদের মধ্যে কতকগুলিকে চিরকুমারী করে রেখে ত্যাগধর্ম শিক্ষা দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানাদি অন্য সব শিক্ষা, যাতে তাদের নিজের ও অপরের কল্যাণ হতে পারে, তাও শেখাতে হবে; তা হলে তারা অতি সহজেই ঐ-সব শিখতে পারবে এবং ঐরূপ শিখতে আনন্দও পাবে। আমাদের দেশে যথার্থ কল্যাণের জন্য এই-রকম কতকগুলি পবিত্রজীবন ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী দরকার হয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন॥ ঐরূপ ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী হলেও দেশের কল্যাণ কেমন করে হবে?

স্বামীজী॥ তাদের দেখে ও তাদের চেষ্টায় দেশটার আদর্শ উল্টে যাবে। এখন—ধরে বিয়ে দিতে পারলেই হল! তা ন-বছরেই হোক, দশ-বছরেই হোক! এখন এ-রকম হয়ে পড়েছে যে, তের বছরের মেয়ের সন্তান হলে গুষ্টিসুদ্ধুর আহ্লাদ কত, তার ধুমধামই বা দেখে কে! এ ভাবটা উল্টে গেলে ক্রমশঃ দেশে শ্রদ্ধাও আসতে পারবে। যারা ঐ-রকম ব্রহ্মচর্য করবে,

তাদের তো কথাই নেই—কতটা শ্রদ্ধা, নিজেদের উপর কতটা বিশ্বাস তাদের হবে, তা বলা যায় না!

শ্রোতা মহাশয় এতক্ষণ পরে স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া উঠিতে উদ্যত হইলেন। স্বামীজী বলিলেন, 'মাঝে মাঝে এস।' তিনি বলিলেন, 'ঢের উপকার পেলুম; অনেক নূতন কথা শুনলুম, এমন আর কখনও কোথাও শুনিনি।' সকাল হইতে কথাবার্তা চলিতেছিল, এখন বেলা হইয়াছে দেখিয়া আমিও স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

স্নান আহার ও একটু বিশ্রাম করিয়া আবার বাগবাজারে চলিলাম। আসিয়া দেখি, স্বামীজীর কাছে অনেক লোক। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা হইতেছে। হাসি-তামাসাও চলিতেছে। একজন বলিয়া উঠিলেন, 'মহাপ্রভুর কথা নিয়ে এত রঙ্গরসের কারণ কি? আপনারা কি মনে করেন, তিনি মহাপুরুষ ছিলেন না, তিনি জীবের মঙ্গলের জন্য কোন কাজ করেন না?'

স্বামীজী॥ কে বাবা তুমি? কাকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করতে হবে? তোমাকে নিয়ে নাকি? মহাপ্রভুকে নিয়ে রঙ্গ-তামাসা করাটাই দেখছ বুঝি। তাঁর কাম-কাঞ্চন-ত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শ নিয়ে এতদিন যে জীবনটা গড়বার ও লোকের ভেতর সেই ভাবটা ঢোকাবার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেটা দেখতে পাচ্ছ না? শ্রীচৈতন্যদেব মহা ত্যাগী পুরুষ ছিলেন; স্ত্রীলোকের সংস্পর্শেও থাকতেন না। কিন্তু পরে চেলারা তাঁর নাম করে নেড়া-নেড়ীর দল করলে। আর তিনি যে-প্রেমের ভাব নিজের জীবনে দেখালেন, তা স্বার্থশূন্য কামগন্ধহীন প্রেম। তা কখনও সাধারণের সম্পত্তি হতে পারে না। অথচ তাঁর পরবর্তী বৈষ্ণব গুরুরা আগে তাঁর ত্যাগটা শেখানর দিকে ঝোঁক না দিয়ে তার প্রেমটাকে সাধারণের ভেতর ঢোকাবার চেষ্টা করলেন। কাজেই সাধারণ লোকে সেই উচ্চ প্রেমভাবটা নিতে পারলে না এবং সেটাকে নায়ক-নায়িকার দূষিত প্রেম করে তুললে।

প্রশ্ন॥ মহাশয়, তিনি তো আচণ্ডালে হরিনাম প্রচার করলেন, তা সেটা সাধারণের সম্পত্তি হবে না কেন?

স্বামীজী॥ প্রচারের কথা হচ্ছে না গো, তাঁর ভাবের কথা হচ্ছে—প্রেম, প্রেম—রাধাপ্রেম। যা নিয়ে তিনি দিনরাত মেতে থাকতেন, তার কথা হচ্ছে।

প্রশ্ন॥ সেটা সাধারণের সম্পত্তি হবে না কেন?

স্বামীজী॥ সাধারণের সম্পত্তি কি করে হয়, তা এই জাতটা দেখে বোঝ না? ঐ প্রেম প্রচার করেই তো সমস্ত জাতটা 'মেয়ে' হয়ে গিয়েছে। সমস্ত উড়িষ্যাটা কাপুরুষ ও ভীরুর আবাস হয়ে গিয়েছে। আর এই বাঙলা দেশটায় চারশ বছর ধরে রাধাপ্রেম করে কি দাঁড়িয়েছে দেখ! এখানেও পুরুষত্বের ভাব প্রায় লোপ পেয়েছে। লোকগুলো কেবল কাঁদতেই মজবুত হয়েছে। ভাষাতেই ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়—তা চারশ বছর ধরে বাঙলা ভাষায় যা কিছু লেখা হয়েছে, সে-সব এক কান্নার সুর। প্যানপ্যানানি ছাড়া আর কিছুই নেই। একটা বীরত্বসূচক কবিতারও জন্ম দিতে পারেনি!

প্রশ্ন॥ ওই প্রেমের অধিকারী তবে কারা হতে পারে? স্বামীজী॥ কাম থাকতে প্রেম হয় না—এক বিন্দু থাকতেও হয় না। মহাত্যাগী, মহাবীর পুরুষ ভিন্ন ও-প্রেমের অধিকারী কেউ নয়। ওই প্রেম সাধারণের সম্পত্তি করতে গেলে নিজেদের এখনকার ভেতরকার ভাবটাই ঠেলে উঠবে। ভগবানের উপর প্রেমের কথা মনে না পড়ে ঘরের গিন্নীদের সঙ্গে যে প্রেম, তার কথাই মনে উঠবে। আর প্রেমের যে অবস্থা হবে, তা তো দেখতেই পাচ্ছ!

প্রশ্ন॥ তবে কি ঐ প্রেমের পথ দিয়ে ভজন করে—ভগবানকে স্বামী ও নিজেকে স্ত্রী ভেবে ভজন করে—তাঁকে (ভগবানকে) লাভ করা গৃহস্থের পক্ষে অসম্ভব?

স্বামীজী॥ দু-এক জনের পক্ষে সম্ভব হলেও সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে যে অসম্ভব, এ-কথা নিশ্চিত। আর এ-কথা জিজ্ঞাসারই বা এত আবশ্যক কি? মধুরভাব ছাড়া ভগবানকে ভজন করবার আর কি কোন পথ নেই? আরও চারটে ভাব আছে তো, সেগুলো ধরে ভজন কর না? প্রাণভরে তাঁর নাম কর না? হৃদয় খুলে যাবে। তারপর যা হবার আপনি হবে। তবে এ-কথা নিশ্চিত জেনো যে, কাম থাকতে প্রেম হয় না। কামশূন্য হবার চেষ্টাটাই আগে কর না। বলবে, তা কি করে হবে?—আমি গৃহস্থ। গৃহস্থ হলেই কি কামের একটা জালা

হতে হবে? স্ত্রীর সঙ্গে কামজ সম্বন্ধ রাখতেই হবে? আর মধুরভাবের ওপরই বা এত ঝোঁক কেন? পুরুষ হয়ে মেয়ের ভাব নেবার দরকার কি?

প্রশ্ন॥ হাঁ, নামকীর্তনটাও বেশ। সেটা লাগেও বেশ, শাস্ত্রেও কীর্তনের কথা আছে। চৈতন্যদেবও তাই প্রচার করলেন। যখন খোলটা বেজে ওঠে, তখন প্রাণটা যেন মেতে ওঠে আর নাচতে ইচ্ছে করে।

স্বামীজী॥ বেশ কথা, কিন্তু কীর্তন মানে কেবল নাচাই মনে কর না। কীর্তন মানে ভগবানের গুণগান, তা যেমন করেই হোক। বৈষ্ণবদের মাতামাতি ও নাচ ভাল বটে, কিন্তু তাতে একটা দোষও আছে। সেটা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে যেও। কি দোষ জানো? প্রথমে একেবারে ভাবটা খুব জমে, চোখ দিয়ে জল বেরোয়, মাথাটাও রি-রি করে, তারপর যেই সঙ্কীর্তন থামে তখন সে ভাবটা হু হু করে নাবতে থাকে। ঢেউ যত উঁচুতে ওঠে, নাববার সময় সেটা তত নীচুতে নাবে। বিচারবুদ্ধি সঙ্গে না থাকলেই সর্বনাশ, সে-সময়ে রক্ষা পাওয়া ভার। কামাদি নীচভাবের অধীন হয়ে পড়তে হয়। আমেরিকাতেও ঐরূপ দেখেছি কতকগুলো লোক গীর্জায় গিয়ে বেশ প্রার্থনা করলে, ভাবের সঙ্গে গাইলে, লেকচার শুনে কেঁদে ফেললে—তারপর গীর্জা থেকে বেরিয়েই বেশ্যালয়ে ঢুকল।

প্রশ্ন॥ তা হলে মহাশয়, চৈতন্যদেবের দ্বারা প্রবর্তিত ভাবগুলির ভেতর কোন্‌গুলি নিলে আমাদের কোনরূপ ভ্রমে পড়তে হবে না এবং মঙ্গলও হবে?

স্বামীজী॥ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সঙ্গে ভগবানকে ডাকবে। ভক্তির সঙ্গে বিচারবুদ্ধি রাখবে। এ ছাড়া চৈতন্যদেবের কাছ থেকে আরও নেবে তাঁর heart (হৃদয়বত্তা), সর্বজীবে ভালবাসা, ভগবানের জন্য টান, আর তাঁর ত্যাগটা জীবনের আদর্শ করবে।

প্রশ্ন॥ ঠিক বলেছেন, মহাশয়। আমি আপনার ভাব প্রথমে বুঝতে পারিনি। (করজোড়ে) মাপ করবেন। তাই আপনাকে বৈষ্ণবদের মধুরভাব নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করতে দেখে কেমন বোধ হয়েছিল।

স্বামীজী॥ (হাসিতে হাসিতে) দেখ, গালাগাল যদি দিতেই হয় তো ভগবানকে দেওয়াই ভাল। তুমি যদি আমাকে গাল দাও, আমি তেড়ে যাব। আমি তোমাকে গাল দিলে তুমিও তার শোধ তোলবার চেষ্টা করবে। ভগবান্ তো সে-সব পারবেন না।

এইবার প্রশ্নকর্তা তাঁহার পদধূলি লইয়া চলিয়া গেলেন। স্বামীজী দর্শনার্থীদের ফিরাইয়া দিতে চাহিতেন না। তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও এ-বিষয়ে কাহারও কথা তিনি রাখিতেন না। বলিতেন, 'তারা এত কষ্ট করে দূর থেকে হেঁটে আসতে পারে, আর আমি এখানে বসে বসে একটু নিজের শরীর খারাপ হবে বলে তাদের সঙ্গে দুটো কথা কইতে পারি না?'

ঐদিন বেলা তিন-চারিটা হইবে। স্বামীজীর সহিত উপস্থিত কয়েকজনের অন্য কথাবার্তা হইতে লাগিল। ইংলণ্ড ও আমেরিকার কথাও হইতে লাগিল। প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী বলিলেনঃ ইংলণ্ড থেকে আসবার সময় পথে বড় এক মজার স্বপ্ন দেখেছিলুম। ভূমধ্যসাগরে আসতে আসতে জাহাজে ঘুমিয়ে পড়েছি। স্বপ্ন দেখি—বুড়ো থুড়থুড়ো ঋষিভাবাপন্ন একজন লোক আমাকে বলছে, 'তোমরা এস, আমাদের পুনরুদ্ধার কর, আমরা হচ্ছি সেই পুরাতন থেরাপুত্ত সম্প্রদায়—ভারতের ঋষিদের ভাব নিয়েই যা গঠিত হয়েছে। খ্রীষ্টানেরা আমাদের প্রচারিত ভাব ও সত্যসমূহই যীশুর দ্বারা প্রচারিত বলে প্রকাশ করেছে। নতুবা যীশু নামে বাস্তবিক কোন ব্যক্তি ছিল না। ঐ-বিষয়ক নানা প্রমাণাদি এই স্থান খনন করলে পাওয়া যাবে।' আমি বললাম, 'কোথায় খনন করলে ঐ-সকল প্রমাণ-চিহ্নাদি পাওয়া যেতে পারে?' বৃদ্ধ বলিল, 'এই দেখ না এখানে।' একথা বলে টার্কির নিকটবর্তী একটি স্থান দেখিয়া দিল। তারপর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙবামাত্র তাড়াতাড়ি উপরে গিয়ে ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন জাহাজ কোন্ জায়গায় উপস্থিত হয়েছে?' ক্যাপ্টেন বলল, 'ওই সামনে টার্কি এবং ক্রীটদ্বীপ দেখা যাচ্ছে।'